বদরুদ্দীন উমর

গণআদালত

অসমাপ্ত মুক্তি সংগ্রামের জের

গণআদালত
অসমাপ্ত মুক্তি সংগ্রামের জের
বদরুদ্দীন উমর

প্রকাশক
মেহেরুননেসা মীরা
মীরা প্রকাশন
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৫

প্রচ্ছদ
রবীন আহসান

প্রকাশকাল
মীরা প্রকাশন এর প্রথম প্রকাশ
আগস্ট-২০০৫

বর্ণবিন্যাস
রুক্কু শাহ্ কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার, ৪র্থ তলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রক
আল ফয়সাল প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দাম
পাচাঁত্তর টাকা
ইউ এস দুই ডলার

GANA ADALAT : ASAMAPTA MUKTI SANGRAMER JER (a Collection of articles, By Badruddin Umar. Published by Meherunnessa Meera, Meera Prokashan, 68-69 Pyari Das Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Cover Design : Robin Ahasan, Date of Publication : Fairst August-2005. Phone : 7175225

Price : Tk. 75.00. US $ 2

ISBN 984-775-088-2

উৎসর্গ

বাঙলাদেশে যাঁরা
ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের
বিরুদ্ধে
সংগ্রাম করে এসেছেন,
শহীদ হয়েছেন
এবং
এখনো সংগ্রাম করছেন
তাঁদের উদ্দেশ্যে

সূচি

দ্বিতীয় মুদ্রণের মুখবন্ধ

গণ আদালত অসমাপ্ত মুক্তি সংগ্রামের জের নামে এই প্রবন্ধ সংকলনটি প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৯৯২ সালে। কিন্তু ছাপা হলেও এটি সে সময়ে ঠিক প্রকাশিত হয়েছিল বলা যায় না। কারণ প্রকাশকের বক্তব্য অনুযায়ী একশো কপি বাঁধানোর পর বইটির সব ছাপা কপি দপ্তরীর হেফাজতে থাকা অবস্থাতেই কয়েকদিন পর নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সামান্য সংখ্যক কপি হাতে হাতে কয়েকজনের কাছে পৌঁছালেও বইটি বাজারজাত করা হয়নি। এদিক দিয়ে বলা চলে, বইটির বর্তমান মুদ্রণই এর প্রথম প্রকাশনা।

এই বইটিতে জামাতে ইসলামের ওপর লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এগুলি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তখন তাৎক্ষণিকভাবে দেখা দিয়েছিল গোলাম আজম বাঙলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়া এবং জামাতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হওয়ার বিরুদ্ধে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ব্যাপক গণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রবন্ধগুলিতে শুধু জামাতে ইসলামীই নয়, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদসহ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের ওপর সাধারণভাবে যে আলোচনা করা হয়েছে সেটা আজকের দিনেও খুব প্রাসঙ্গিক।

এটি প্রকাশের জন্য মীরা প্রকাশন ও হারুনুর-রশীদ সাহেবকে ধন্যবাদ।

১৯.০৭.২০০৫

মুখবন্ধ

বাঙলাদেশ নামে পরিচিত এই অঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শোষক শ্রেণীসমূহ কর্তৃক ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। ষাটের দশক থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের এই বিভিন্নতা সম্পর্কে আমি বহু সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছি। সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতির সংকট, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা এবং বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার নামক চারটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও এ সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ অন্যান্য সংকলনেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা যখন ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মুখ্য রূপ ছিলো তখন মুসলিম লীগ মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের উপর ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই অঞ্চলে মুসলমানদের হাতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত ও কেন্দ্রীভূত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অকেজো হতে থাকে এবং তার পরিণামে শেষ পর্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লীগ ক্ষমতাচ্যুত ও প্রায় বিলুপ্ত হয়।

বাঙলাদেশ একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি এদেশে আর না থাকার ফলে কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ হয়েছে এবং শোষক শ্রেণীসমূহের স্বার্থে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়েছে। আমাদের মতো পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশে অগ্রসর এবং উন্নত দেশের তুলনায় ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শোষক শ্রেণীসমূহের জন্য অনেক বেশী প্রয়োজন। কাজেই এখানে বাহ্যতঃ সাম্প্রদায়িক নয় অথবা মৌলবাদের সাথে একেবারে সম্পর্কহীন রাজনৈতিক দলও প্রয়োজন অনুযায়ী নানাভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বাঙলাদেশ আমলেও প্রায় প্রথম থেকেই করে এসেছে এবং এখনো করছে।

বাঙলাদেশে যে রাজনৈতিক দলটি ধর্মের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ব্যবহার করে থাকে সেটি হলো জামাতে ইসলামী। এরা কোন সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে গঠিত হয়নি এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও ইসলামী আইন প্রবর্তন ও প্রচলনের ঘোষণা প্রদান করে এরা রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে। এটাই মূল কারণ যে জন্য এদেরকে ধর্মীয় মৌলবাদী

হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার নামক প্রবন্ধ সংকলনটিতে বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার নোতুন পরিস্থিতিতে শোষক শ্রেণীসমূহ কিভাবে করছে সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে। সাম্প্রদায়িকতা থেকে ধর্মীয় মৌলবাদের আশ্রয় নিতে কেন ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারীরা বাধ্য হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান যে মূলতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে করা দরকার এটা না বোঝার ফলেই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের চরিত্র এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। এ কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে গোলাম আজমকে **জামাতে ইসলামী** তাদের আমীর নিযুক্ত করার পর বাঙলাদেশে **জামাতে ইসলামীর** বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশঃ দানা বাঁধতে থাকে এবং ২৬শে মার্চের গণআদালতে গোলাম আজমকে ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী নানা জঘন্য অপরাধের জন্য এক চরম দুষ্কৃতিকারী হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। গোলাম আজমকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও যে পরিস্থিতিতে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের সংগ্রাম শুরু হয়েছে সেই পরিস্থিতির আলোচনা বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে করা হয়েছে। বাঙলাদেশের বিশেষ আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে একটি ইসলামী মৌলবাদী দল হিসেবে **জামাতে ইসলামীর** দুর্বলতা এবং গোলাম আজমের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মোকাবেলা করতে দাঁড়িয়ে **জামাতে ইসলামী** কিভাবে তার মৌলবাদী অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, কিভাবে এ ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদপসরণ ঘটছে সে বিষয়েও কিছু আলোচনা এখানে করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশের জন্য বস্তু প্রকাশন এবং আজিজ মেহেরকে অনেক ধন্যবাদ।

বদরুদ্দীন উমর
ঢাকা

২৯.৪.১৯৯২

বাঙলাদেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

বাঙলাদেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা এবং প্রচারণা বিভিন্ন মহলে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতে বাঙলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রচারণা এখন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠা পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্যই এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তিকর প্রচারণার সুযোগেরও অভাব ঘটছে না।

বৃটিশ ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্ব, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব, জাতি দ্বন্দ্ব, ভাষা দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব উনিশ ও বিশ শতকের রাজনীতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলির মধ্যে বৃটিশ বিরোধিতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত, কতকগুলি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে, প্রাধান্যে আসার ফলে পরিস্থিতির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ এইভাবে বিভক্ত হওয়ার সময়ে পাঞ্জাব এবং তৎকালীন বাঙলাদেশও দুইভাগে বিভক্ত হয়ে একটি অংশ ভারত এবং অপর অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ভারত বিভাগকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা সমাধান হিসেবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্বীকার করে নিলেও স্বাধীন হওয়ার মুহূর্তেই পাঞ্জাব থেকে বাঙলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং পাঞ্জাবে এমন এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা একটানাভাবে সংঘটিত হয় যার ফলে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানী পাঞ্জাব থেকে হিন্দু ও শিখ এবং ভারতীয় পাঞ্জাব থেকে মুসলমান জনগোষ্ঠী যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান "হিজরত" করে। এই সাম্প্রদায়িক "হিজরতের" ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, জীবিকা, মান ইজ্জত ঘর গেরস্থালী ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে সেখানে সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিভূমি বিনষ্ট হয়। এভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক সমস্যার "সমাধান" হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক শান্তি। এ শান্তি এখনো পর্যন্ত নির্বিঘ্ন আছে। পাকিস্তান সরকারের ভারত বিরোধী নীতি সত্ত্বেও পরিস্থিতির এ দিকটার প্রতি নজর না দিলে সারা উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সঠিক উপলব্ধিই সম্ভব নয়।

উভয় পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এই শান্তি বস্তুতপক্ষে পরস্পরকে নিজ নিজ অঞ্চল থেকে উৎখাত করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের থেকে হিন্দু ও শিখদের প্রতি এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের থেকে মুসলমানদের অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে এখন আর কোন হুমকি নেই। এই হুমকির অনুপস্থিতি উভয় অঞ্চলের রাজনীতির মধ্যেও নিশ্চিতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এ কারণে পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছেন না। সে রকম কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বও সেখানে নেই। পশ্চিম পাকিস্তানেরও হিন্দু অথবা শিখদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম নেই। তার জন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সেখানেও নেই।

১৯৪৭ সালে পূর্ব বাঙলায় পাঞ্জাবের মতো কোন সর্বব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা না হলেও ১৯৫০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় বেশ বড়ো আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। তার আগে থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলা থেকে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানরা পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলায় যেতে শুরু করলেও ১৯৫০ সালের পর থেকে এদিক দিয়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বিশেষতঃ বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব ব্যাপক আকারে পূর্ব বাঙলা ত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলায় "হিজরত" করেন।

এর ফলে পূর্ব বাঙলাতেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের প্রতি কোন হুমকি, এমনকি প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়। এবং ঠিক এ কারণেই পূর্ব বাঙলা থেকে সব হিন্দু অন্যত্র চলে না গেলেও এবং এখানে প্রায় এক কোটি হিন্দু বসবাস করলেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমি দ্রুত বিনষ্ট হতে থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ব বাঙলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটতে থাকে। বড়ো আকারে এই নোতুন রাজনীতির প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে, বিশেষতঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। যুব লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী পার্টি ইত্যাদি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সংগঠন ও দল এ সময় গঠিত হয়। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলেও ১৯৫৩ সালে তারা সাম্প্রদায়িক চরিত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্তন করে দলটির নামকরণ করে আওয়ামী লীগ। ১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে গঠন করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হওয়ার মধ্য দিয়েই পূর্ব বাঙলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে এ দেশের জনগণ কবরস্থ করেন। এজন্য ঐ নির্বাচনের পর থেকে আজ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাঙলা বা পূর্ব পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাঙলাদেশে কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দলই আর কার্যকরভাবে তৎপর হতে পারেনি। মুসলিম লীগ নিজের অস্তিত্ব কোনমতে টিকিয়ে রাখলেও তাদের কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব ১৯৫৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলের রাজনীতিতে আর নেই।

বাঙলাদেশে এখনো যার অস্তিত্ব কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে আছে সেটা হলো এক ধরনের হিন্দু বিদ্বেষ। হিন্দুদেরও আছে মুসলমান বিদ্বেষ। এই ধর্মীয় বিদ্বেষীদের

সংখ্যা বেশী না হলেও এদের অস্তিত্ব সামাজিক পর্যায়ে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হওয়া কোন সময়েই সম্ভব নয়। এমনকি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও বেশ কিছুকাল এ ধরনের লোকের ও দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব থাকবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত ও গণ্য করা এক বড়ো ধরনের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিভ্রান্তি।

এখানে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব ও শক্তি নির্ণয়ের একটি উপায় হলো সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার সংখ্যা, পুনরাবৃত্তি ও ব্যাপকতা। এ দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে ১৯৬৪ সালের পর এই অঞ্চলে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর সংঘটিত হয়নি। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে ভারতে বাবরী মসজিদ রামজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার প্রতিক্রিয়ায় বাঙলাদেশে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কয়েকটি স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে সে বিষয়ে পরে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন হাঙ্গামা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বর্তমানে বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলতে রাজনৈতিক অর্থে যা বোঝায় তার বিশেষ কোন প্রভাব নেই। এ প্রভাব না থাকার কারণেই এখানে এমন কোন ধর্মীয় রাজনৈতিক দল নেই যারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ভোটের রাজনীতিতে অথবা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে নিযুক্ত রয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে সাম্প্রদায়িকতা হলো একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থেকে সৃষ্ট এক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই গঠিত হয় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। এ কারণে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সব সময়েই সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, যেমনভাবে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিলো মুসলিম লীগ রাজনীতি এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিলো কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার রাজনীতি। কংগ্রেসের বাহ্যিক অসাম্প্রদায়িক ভড়ং সত্ত্বেও একথা সত্য।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর এই অঞ্চলে মুসলমানদের অথবা অপর কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়ে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এর মূল কারণ দুটি। প্রথমতঃ, তৎকালীন পূর্ব বাঙলায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ভূমি অপসারিত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, এই অঞ্চলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের পরিবর্তে বাঙালী-অবাঙালী দ্বন্দ্বই অর্থনৈতিক জীবন ও স্বার্থ ক্ষেত্রে ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকা। এ কারণে এই দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের ভিত্তিতেই রাজনীতির দ্রুত রূপান্তর এ অঞ্চলে ঘটতে শুরু করে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। এই দুই ক্ষেত্রেই মূল রাজনৈতিক আন্দোলনের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘু ছিলো না। তার লক্ষ্যবস্তু ছিলো ক্ষমতাসীন চক্র ও তৎকালীন শাসক শ্রেণী, যার মধ্যে আবার প্রাধান্য ছিলো অবাঙালী বা পশ্চিম পাকিস্তানীদের। এভাবে পূর্ব বাঙলার রাজনীতিতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে জাতিগত, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক দ্বন্দ্বই প্রাধান্যে আসে এবং সেই দ্বন্দ্বের দ্বারাই ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই

অঞ্চলের রাজনীতির মুখ্য দিক ও গতিধারা নির্ধারিত হয়। এই দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করেই আওয়ামী লীগের রাজনীতি গঠিত হয় ও শক্তি অর্জন করে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পশ্চিম পাকিস্তানী এবং অবাঙালী বিরোধী রাজনীতির পাশাপাশি রাজনীতির অন্য দুটি ধারাও বিকশিত হয়। এদের একটিকে মূলতঃ অন্যটির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে।

এই দুটি ধারার মধ্যে প্রথমটি হলো, শ্রেণী ভিত্তিক রাজনীতির ধারা যার মূল সংগঠন ছিলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি। এই পার্টির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গণসংগঠন—শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ইত্যাদি সংগঠন ও অসাম্প্রদায়িক শ্রেণী ভিত্তিক রাজনীতিতে নিযুক্ত থাকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরে তার একাধিক বিভক্ত ও খণ্ডিত অংশের মধ্যে যে সব সংশোধনবাদী প্রভাব ছিলো সেগুলির উল্লেখ এবং আলোচনা বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ তাদের সেই সব বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাদের রাজনীতির একটি অসাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণীগত পরিচয় ছিলো অনস্বীকার্য।

অন্য ধারাটি ছিলো ধর্মীয় রাজনীতির ধারা, যার মূল সংগঠক ছিলো জামাতে ইসলামী। ষাটের দশকের শেষ দিকেই এই রাজনৈতিক দলটি আওয়ামী লীগ অথবা বামপন্থী দলগুলির মতো শক্তিশালী না হলেও কিছুটা সংগঠিত হয়। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, তৎকালে ষাটের দশকেই কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি আগের যে কোন সময়ের থেকে বেশী হয়, শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন বেশ ব্যাপকভাবে গঠিত হতে থাকে এবং শ্রেণী শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আওয়াজও দিকে দিকে উত্থিত হয়। সেই পরিস্থিতিতে জামাতে ইসলামীর কিছুটা সাংগঠনিক বিকাশ ঘটে বস্তুতঃপক্ষে এই শ্রেণী রাজনীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই। গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলেও শোষক শাসক শ্রেণী ১৯৫৪ সাল থেকে মধ্য ষাটের দশক পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিশেষ কোন সুযোগ পায়নি। তার কোন প্রয়োজনও সেভাবে দেখা দেয় নি। কিন্তু মধ্য ষাটের দশক থেকে শ্রেণী রাজনীতি এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে তার জন্য তৎকালীন শাসক শোষক শ্রেণীর মধ্যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের একটা তাগিদ দেখা দেয়। জামাতে ইসলামীর রাজনীতির কিছুটা বিকাশ এই তাগিদেরই পরিণতি।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জামাতে ইসলামীর ধর্মীয় রাজনীতি এবং মুসলিম লীগের ধর্মীয় রাজনীতির মধ্যে অর্থাৎ এ দুইয়ের দ্বারা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মধ্যে খুব বড়ো ধরনের পার্থক্য ছিলো। মুসলিম লীগ যেখানে ধর্মকে ব্যবহার করতো অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে এমনকি তাদেরকে শারীরিকভাবে আক্রমণের উদ্দেশ্যে, সেখানে জামাতে ইসলামী অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রচারণা করতো না। তাদের প্রচারণা ছিলো মূলতঃ শ্রমিক কৃষকের শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতির বিরুদ্ধে, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া তাদের আক্রমণের অপর লক্ষ্যবস্তু ছিলো জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান সরকারও সে সময়ে মূলতঃ এই দুই উদ্দেশ্যেই ইসলামকে ব্যবহার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো। অন্য কারণে

সরকারের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর কিছু বিরোধিতা থাকলেও এ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ছিলো একটা গভীর ঐক্য।

১৯৭১ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই অঞ্চল থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র উচ্ছেদ হয়ে বাঙলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি অপসারিত হতে থাকলে বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তার ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। এছাড়া ভাষাগত, জাতিগত এবং আঞ্চলিক দ্বন্দ্বেরও অবসান এর মাধ্যমে এমনভাবে হয় যার ফলে এই দ্বন্দ্বগুলির ব্যবহারের দ্বারা সামগ্রিক রাজনীতির উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারের কোন সম্ভাবনা আর থাকে না, যদিও ভাষাগত, জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি অসম ব্যবহারের পরিপূর্ণ অবসান এখন হয়েছে একথা বলা চলে না। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত নিপীড়ন আঞ্চলিক শোষণ নির্যাতনও পুরোদস্তুর আছে। এসব সত্ত্বেও একথা আবার কিছুতেই বলা চলে না যে সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত, জাতিগত এবং আঞ্চলিক কোন দ্বন্দ্ব বর্তমান বাঙলাদেশের মূল রাজনৈতিক ধারাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে বাঙলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সেটা ঘটছেও না।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের পর বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের কোন প্রয়োজন এবং সুযোগ শোষক শাসক শ্রেণীর নেই। উপরন্তু এর প্রয়োজন এবং সুযোগ দুইই আছে। প্রয়োজন দেখা দিয়েছে শ্রেণী সংগ্রাম বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে এবং তার সুযোগ রয়েছে দেশের জনগণের সাধারণ পশ্চাৎপদতার মধ্যে।

১৯৭১ সালে রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি যে ঠেঙাড়ে বাহিনীগুলি সরকার ও জামাতে ইসলামীর দ্বারা গঠিত হয়েছিলো তারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় হাজার হাজার দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলো। এই অপরাধীদের অনেককে আওয়ামী লীগ সরকার গ্রেফতার করেছিলো। তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিলো। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণেরও প্রভাব ছিলো না। আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বিচারের প্রতিশ্রুতিও জনগণকে দিয়েছিলো।

এসব সত্ত্বেও দেখা গেলো যে, ১৯৭৩ সালে ঐ একই আওয়ামী লীগ সরকার গ্রেফতারকৃত রাজাকার আলবদরদের প্রতি সাধারণ ক্ষমতা ঘোষণা করলো এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এই কারামুক্ত অপরাধীদের প্রতি আহ্বান জানালেন দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য! তাদেরকে সমাজে এবং রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করার প্রাথমিক প্রস্তুতিও স্বাভাবিকভাবে সেই সঙ্গে শুরু হলো। তাদের এই পুনর্বাসন জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে প্রায়-সম্পূর্ণ হয়। পুনর্বাসন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে জিয়াউর রহমানের সরকার জামাতে ইসলামীসহ সকল ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলকে আইনসঙ্গতভাবে খোলাখুলি কাজের অনুমতি প্রদান করে।

জামাতে ইসলামীই বর্তমান বাঙলাদেশে সর্বপ্রধান ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু তা হলেও জামাতে ইসলামী কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল নয়। নিজের রাজনৈতিক তৎপরতা এরা কোন বিশেষ ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করছে না। এদিক দিয়ে বৃটিশ আমলে অথবা পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগের যে রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলো তার সঙ্গে জামাতে ইসলামীর ভূমিকার কোন মিল নেই। এই পার্থক্য এবং পার্থক্যের গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি না করলেও এ দেশের রাজনীতির অনেক কিছুই দুর্বোধ্য থেকে যাবে এবং তার ফলে ধর্মের এই রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রামও ঠিকমতো সংগঠিত করা সম্ভব হবে না। আসলে এ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির জন্য সেটা প্রকৃতপক্ষে হচ্ছেও না।

কোন রাজনীতি অথবা রাজনৈতিক সংগঠন সাম্প্রদায়িক কিনা সেটা বোঝার জন্য দেখা দরকার তার (ক) প্রচার প্রচারণা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কি না, (খ) সেই ধরনের প্রচারের কোন আর্থ-সামাজিক ভিত্তিভূমি আছে কি না, (গ) আক্রমণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু কারা, সে আক্রমণ আদর্শগত অথবা শারীরিক যাই হোক। এসব দিক দিয়ে বিচার করলে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি দলকে নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক বলা চলে। কিন্তু জামাতে ইসলামীকে কিছুতেই রাজনৈতিক অর্থে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। কারণ তাদের প্রচার প্রচারণার মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান কোন ধর্ম অথবা ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য নেই। সেই বক্তব্য প্রদানের কোন আর্থ-সামাজিক ভিত্তি নেই। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুও অপর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক হিসেবে কেউ নয়।

জামাতে ইসলামীর প্রচার প্রচারণার এবং আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো, শ্রমিক কৃষকের শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী অথবা তারা যাকে সে ধরনের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বলে মনে করে তাদের বিরুদ্ধে। যে কোন গণতান্ত্রিক অথবা প্রগতিশীল শক্তি অথবা তারা যাদেরকে সেভাবে বিবেচনা করে তাদের বিরোধিতাও জামাতে ইসলামী কিছুটা করে থাকে। অবশ্য তাদের মূল অবস্থান কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের শ্রেণী শত্রু তাদের বিরুদ্ধে। এদিক দিয়ে জামাতে ইসলামীর শ্রেণী চরিত্র মুসলিম লীগের শ্রেণী চরিত্র থেকে অনেক বেশী স্পষ্ট এবং উচ্চারিত। জামাতে ইসলামীর তথাকথিত ইসলামী মৌলবাদের এটাই হলো আসল চরিত্র। কাজেই উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে প্রায় একশো বছর এই উপমহাদেশে ধর্মের যে ধরনের রাজনৈতিক ব্যবহার সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে হয়েছিলো বাঙলাদেশে সে ধরন এখন পরিবর্তিত হয়েছে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার স্থান দখল করেছে ধর্মীয় মৌলবাদ।

মুসলিম লীগ ছিলো একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। তার ছিলো এক বিশেষ ধরনের দাঙ্গা যেখানে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিলো হিন্দুরা অথবা শিখরা। কংগ্রেসী অথবা হিন্দু মহাসভাপন্থী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিলো মুসলমানরা। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উগ্র জাতীয়তাবাদী রূপ পরিগ্রহ করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এবং বাঙালীদের উপর পাকিস্তানীদের নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় অন্য আর এক ধরনের দাঙ্গা—বাঙালী-

অবাঙালী দাঙ্গা। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের দিকে ঢাকায় এ ধরনের একটা বড়ো বাঙালী-বিহারী দাঙ্গা হয়। এছাড়া ১৯৭০-৭১ সালে দেশের বিভিন্ন এলাকাতেও বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা ঘটতে দেখা যায়, যাতে দুই পক্ষেরই হাজার হাজার লোক নিহত হন। দ্বন্দ্বের চরিত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐভাবে পরিবর্তিত হয় দাঙ্গারও চরিত্র।

বর্তমানে জামাতে ইসলামীও রাজনৈতিকভাবে বেশ জোরালো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে থাকে এবং তাদের হাতে প্রায়ই রাজনৈতিক কর্মীরা, বিশেষতঃ ছাত্র কর্মীরা নিহত হন। এই কর্মীদের মধ্যে সকলেই মুসলমান পরিবার থেকে আগত। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যদি অন্য কোন ধর্মাবলম্বী কেউ নিহত হন তাহলে তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায়গত কারণে নিহত হন না। সেটা ঘটে অন্য রাজনৈতিক কারণে, যার সঙ্গে ধর্মীয় রাজনীতির অথবা নিহত ব্যক্তির কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

জামাতে ইসলামী তার রাজনৈতিক প্রচার প্রচারণায় অপর কোন ধর্মের অথবা ধর্মীয় দল ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলে না। তাদের প্রচারে আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তুও হলো বস্তুবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সাম্যবাদ এবং সব ধরনের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা।

কাজেই বাঙলাদেশে জামাতে ইসলামের রাজনৈতিক প্রভাব কিছুটা বৃদ্ধি হওয়া থেকে কেউ যদি মনে করেন যে, এখানে সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি ও প্রসার হচ্ছে তাহলে তিনি মস্ত ভুল করবেন। এদিক দিয়ে ভারতের বি.জে.পি-র সঙ্গে জামাতে ইসলামীর বিরাট পার্থক্য। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু আলোচনার আগে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদের সরকার কর্তৃক রাষ্ট্র ধর্ম আইন প্রণয়ন সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার।

এরশাদ যখন রাষ্ট্র ধর্ম বিল উত্থাপন করেন তখন থেকেই এই বিলটিকে হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উপরে আক্রমণ হিসেবে শুধু যে এইসব ধর্মাবলম্বী লোকরাই মনে করেছেন তাই নয়। এখানকার অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি এবং সংগঠনই আইনটিকে সেইভাবে ব্যাখ্যা করে তার বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। এই ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

এরশাদের রাষ্ট্র ধর্ম আইনে ইসলামকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে ঘোষণার উদ্দেশ্য মোটেই ধর্মীয় নয়। এই ঘোষণার পক্ষে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগণের স্বার্থের কোনই সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, এই বিলটি প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরুদ্ধেই সংখ্যালঘু শোষক শাসক শ্রেণীর একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো, জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা, ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের মূল আর্থ-রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া থেকে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে তাঁদেরকে বিভ্রান্ত বিভক্ত ও বিপথগামী করা।

বাঙলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণার মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণের জীবনে, ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জীবনেও, কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। এর মাধ্যমে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে বেতার ও টেলিভিশনে ধর্মীয় প্রোগ্রামের সময় বৃদ্ধি এবং নির্যাতন।

এখানে অবশ্য বলা দরকার যে সামরিক সরকারও ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করে বিশেষ উপকৃত হয়নি। যদি হতো তাহলে এ কাজ করার অল্পদিন পরই তারা জনগণের ব্যাপক আক্রমণের মুখে পড়ে উৎখাত হতো না। আসলে এ ধরনের ধর্মীয় কর্মসূচীর মাধ্যমে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ পরিচালনার মতো আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিই আজকের বাঙলাদেশে নেই।

ভারতের পরিস্থিতির সঙ্গে এ দিক দিয়ে বাঙলাদেশের পরিস্থিতির পার্থক্য খুব বড়ো ধরনের। এ কারণে ১৯৯০ সালের শেষ দিকে বাবরী মসজিদ ভেঙে ফেলার সংবাদ এখানে প্রচারিত হওয়ার পর যে সব বিক্ষিপ্ত আক্রমণ হিন্দু মন্দিরের বিরুদ্ধে হয়েছিলো সে আক্রমণকে হত্যার রাজনীতিতে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সেই সব আক্রমণ জনগণের দ্বারা নয়, এরশাদের সামরিক সরকারের ভাড়াটে লোকদের দ্বারাই মূলতঃ পরিচালিত হয়েছিলো। দাঙ্গা বন্ধ করা ও নিয়ন্ত্রণের নামে এরশাদ সে সময় ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারী করলেও তার কোন প্রয়োজনই ছিলো না। উপরন্তু সান্ধ্য আইনের সুযোগে এরশাদের ভাড়াটে বাহিনীর লোকেরা নিশ্চিন্তে কিছু কিছু মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙচুর এবং দুই একটিতে অগ্নি সংযোগ করেছিলো। এসব তথ্য ভারতীয় সংবাদপত্রে এভাবে প্রচারিত না হয়ে কিছুটা অন্যভাবে প্রচারিত হয়েছিলো এবং সেখানকার হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় নামার সুযোগ পেয়েছিলো। এরশাদ সরকার সে সময় যদি ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারী না করতো তাহলে বিপুল সংখ্যায় জনগণ মিছিল করে গিয়ে দাঙ্গাকারীদেরকে প্রতিহত করতো, যেটা তারা সে সময় বিভিন্ন এলাকায় করেছিলো।

এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো এই যে, ১৯৯০ সালে অক্টোবর-নভেম্বরে সেই সাম্প্রদায়িক উস্কানীর সময় কোন হিন্দু হত্যা হয়নি বলা চলে। দু এক জায়গায় সে রকম ঘটনা ঘটলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণতি হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। কারণ এ ধরনের হত্যা এবং মানুষ খুন এখন বাঙলাদেশে একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং যাঁরা খুন হচ্ছেন তাঁরা সকলেই মুসলমান, দুই এক ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি।

বাঙলাদেশ থেকে হিন্দুরা এখানে "হিজরত" করে কিছু সংখ্যায় বাঙলাদেশ থেকে ভারতে যান। তাঁদের মধ্যে সকলের না হলেও কারো কারো জমিজমা মুসলমানরা জোরপূর্বক দখল করে। কিন্তু এর থেকে মনে করার কোন কারণ নেই যে, আসলে সাম্প্রদায়িক কারণেই এসব ঘটছে। এদেশের গ্রামীণ জনগণ খুব ব্যাপক আকারে জমি জমা ঘর বাড়ী থেকে উৎখাত হচ্ছেন। উৎখাত হয়ে শহরে, বিশেষ করে ঢাকার দিকে আসছেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু থাকলেও মুসলমানদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। এইভাবে যে হিন্দুরা উৎখাত হচ্ছেন তাঁরা মূলতঃ হিন্দু হিসেবে উৎখাত হচ্ছে না। সেটা হচ্ছেন দরিদ্র হিসেবে এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণে। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁদের অসুবিধা মুসলমানদের থেকে কিছু বেশী। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আবার বলা দরকার যে, জমি থেকে এই উৎখাত হওয়ার ব্যাপারটি মূলতঃ সাম্প্রদায়িক কারণে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও ঘটছে না। ঘটছে এ দেশের লুটপাট ও নির্যাতনকারী শোষক

শাসক শ্রেণীর নির্যাতন বৃদ্ধির কারণে। এই প্রক্রিয়ায় শোষিত ও নির্যাতিতদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ই আছেন এবং মুসলমানরাই অনেক বেশী। ঠিক তেমনি শোষক নির্যাতকদের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান উভয়ই আছে এবং এক্ষেত্রেও মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

এই উৎখাত হওয়া দরিদ্রদের মধ্যে সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের থেকে হিন্দুদের অবস্থা এক দিক দিয়ে ভালো। কারণ উৎখাত হয়ে তাঁদের ভারতে যাওয়ার মতো একটা সুযোগ রয়েছে, যে সুযোগ মুসলমানদের জন্যে সেভাবে নেই। এবং ঠিক এ কারণে দেখা যায়, বাঙলাদেশ থেকে ঘরবাড়ী হারিয়ে অথবা কর্মচ্যুত হয়ে যাঁরা ভারতে যান তাঁদের মধ্যে বিপুল অধিকাংশই হিন্দু। এইভাবে "হিজরত" করা হিন্দুরা ভারতে গিয়ে নিজেদের নোতুন অবস্থান সৃষ্টি ও নিরাপত্তা অর্জনের জন্য সাম্প্রদায়িকতার অনেক গাল গল্পই সৃষ্টি করেন। এই গাল গল্প ভারতীয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণার জন্য সৃষ্টি করে নোতুন নোতুন সুযোগ। এই সুযোগের "সদ্ব্যবহারই" করে থাকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বি.জে.পি.)-র মতো চরম সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল।

এই সাম্প্রদায়িক প্রচারণা বি.জে.পি.-র নিজের সাম্প্রদায়িক প্রচারণার জন্য প্রয়োজন। কারণ বাঙলাদেশে হিন্দুদের উপর সাম্প্রদায়িক নির্যাতন হচ্ছে একথা প্রচার করলে ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের কিছুটা সুবিধা হয়, যদিও ভারতীয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বাঙলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। তার নিজস্ব ভিত্তি ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেই নিহিত আছে।*

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে কিছুদিন ধরে যে বর্ণ সংঘর্ষ চলছে এবং যা ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করছে সেটা শ্রেণী সংঘর্ষেরই একটি বিশেষ রূপ, যদিও তা শ্রেণী সংগ্রামের সমার্থক নয়। এই বর্ণ সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বর্ণহিন্দু বিরোধী সংগ্রামকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার উদ্দেশ্যেই ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুদের মূল রাজনৈতিক দল বি.জে.পি. তার রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করছে। এই কাজ করতে গিয়ে তারা একটি ঐতিহাসিক মসজিদ ভেঙে তার স্থলে মন্দির নির্মাণের যে কর্মসূচী নিয়েছে সেটা যে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল তাই নয়, হাস্যকরভাবে প্রতিক্রিয়াশীল।

ভারতের দ্বিতীয় প্রধান রাজনৈতিক দলের এই আদর্শগত দেউলিয়াপনা শুধু যে ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতিই নির্দেশ করছে তাই নয়, সেটার মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে এমন এক সংকটের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—যার গভীরতা, মর্মার্থ এবং পরিণতি সম্পর্কে অল্প সংখ্যক ভারতীয়েরই ধারণা আছে।

* এ বিষয়ে আমি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'সংস্কৃতি'র সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় 'ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি' নামক একটি প্রবন্ধে।

তবে এ আলোচনা শেষ করার সময় একথা বলে শেষ করা দরকার যে, বাঙলাদেশে কোন রাজনৈতিক দল এই ধরনের কোন কর্মসূচীর চিন্তাই করতে পারবে না। কেউ যদি এই ধরনের কর্মসূচী নিয়ে অর্থাৎ কোন মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ তৈরীর কর্মসূচী নিয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহলে জনগণ অন্য কোন অস্ত্রের ব্যবহার না করে প্রকাশ্যে পাদুকার দ্বারা প্রহার করেই তাদেরকে শায়েস্তা করবে।

১৪.১২.১৯৯১

সংস্কৃতি
নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯২

বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনীতি ও জামাতে ইসলামী প্রসঙ্গ

বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এখন এমন পর্যায়ে এবং এতো ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে যার কোন পূর্ব উদাহরণ এদেশে নেই।

১৯৭১ সালের পাকিস্তান বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করা হয়েছিলো, ইসলামকে জনগণের উপর দমন পীড়ন নির্যাতনের কাজে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছিলো তার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে একটা গভীর ও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। এ কারণে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই অঞ্চল থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র উচ্ছেদ হওয়ার পর জামাতে ইসলামীসহ সব ধরনের ধর্ম ব্যবসায়ীরা জনগণের রোষ থেকে রক্ষা লাভের জন্য আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলো। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারও এর থেকে ফায়দা ওঠাবার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় রাজনীতি এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন বেআইনী করেছিলো।

আজ সেই পরিস্থিতি যে শুধু পরিবর্তিত হয়েছে তাই নয়। জনগণের ভয়ে যারা ১৯৭১-৭২ সালে আত্মগোপন করেছিলো, দেশত্যাগ করেছিলো এবং নিজেদের ভোল পাল্টে সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতো তারা আজ বেপরোয়াভাবে শুধু যে নোতুন উদ্যমে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করছে তাই নয়। তারা আজ বাস্তবতঃ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে।

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির চরিত্র সঠিকভাবে বোঝাবার জন্য দেখা দরকার কিভাবে ধাপে ধাপে ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীলরা এদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধাপগুলির দিকে খেয়াল রাখলে বর্তমান পরিস্থিতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে সঠিক ধারণা হবে এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিভাবে সংগঠিত করা দরকার সে বিষয়েও ধারণা স্পষ্ট হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার যে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম থেকে শাসক শ্রেণী ও শাসক দলের বিচ্ছিন্নতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর দেশে শোষক শ্রেণীর বাঙালী অংশটিই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। শোষক শ্রেণীর লঘিষ্ঠ অংশ থেকে তারা পরিণত হয় শুধু গরিষ্ঠ অংশে নয়, প্রায় সর্বাংশে। এর ফলে তারা হয়ে দাঁড়ায় জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, অর্থ-সংস্থা, বাড়ীঘর ইত্যাদি সব ধরনের সম্পত্তি মালিকে। আগে যেখানে শ্রমজীবী

জনগণের শোষক নির্যাতক হিসেবে অবাঙালী পাকিস্তানীরা প্রাধান্যে ছিলো সেখানে এই পর্যায়ে বাঙালীরাই দেশীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয় শোষক নির্যাতকে। কাজেই পাকিস্তানী আমলে জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণী এবং শোষক শ্রেণীর বাঙালী অংশের মধ্যে পাকিস্তানী বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে স্বার্থের যে আংশিক ঐক্য ছিলো সে ঐক্য পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ বাঙলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর থাকে নি। থাকার কথাও নয়। কারণ বাঙলাদেশে বাঙালী জাতি শোষক ও শোষিত এবং শাসক ও শাসিত শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত।

এই দ্বিধা বিভক্তি এবং শোষিত এবং এই অঞ্চলে জাতিগত, ভাষাগত, আঞ্চলিক, ধর্মীয় ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে পাকিস্তানী আমলের মতো শোষক শাসক ও শোষিত নির্যাতিতের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব না থাকায় অথবা কিছুটা থাকলেও সেগুলির কোনটিই প্রাধান্যে না থাকাতে এ ধরনের কোন দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করার সুযোগ এবং ক্ষমতা শোষক শাসক শ্রেণীর আর থাকেনি। পরিস্থিতির এই দিকটির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলে বর্তমানে বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিষয়টিকে এই যথার্থ প্রেক্ষিতে দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়।

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মীয় রাজনীতি এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা করার পর বৎসরই, আলবদর, জামাতপন্থীদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং শেষ পর্যন্ত এই চরম প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্ম ব্যবসায়ী ঘাতক দালালদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এমন একটি বিষয় যার বিরোধিতা করাই যথেষ্ট নয়। আওয়ামী লীগ কর্তৃক এই ক্ষমা ঘোষণার এবং রাজাকার, আলবদর, জামাতপন্থীদের কাছে দেশগড়ার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বানের আসল কারণটি না বুঝে এই বিরোধিতা করতে দাঁড়ালে তাতে বিশেষ লাভ নেই। এবং লাভ যে নেই সেটা ১৯৭৩ থেকে এ পর্যন্ত বিকাশমান পরিস্থিতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

আওয়ামী লীগ কর্তৃক ক্ষমা ঘোষণা এবং জামাতপন্থীদের প্রতি পরিবর্তিত নীতি আওয়ামী লীগের দ্রুত জনবিচ্ছিন্নতার সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিলো।

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ এবং তার নেতা শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন। এই রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা আবার ছিলো আওয়ামী লীগের কাছে জনগণের প্রত্যাশারও প্রতিফলন। আওয়ামী লীগ কর্তৃক ক্ষমতা দখলকে জনগণ সমর্থন করেছিলেন এবং তার দ্বারা উল্লসিত হয়েছিলেন এ কারণে যে, তাঁরা আশা করেছিলেন যে আওয়ামী লীগ এই ক্ষমতার ব্যবহার করে তাঁদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বড়ো ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

কিন্তু সে পরিবর্তন আনা আওয়ামী লীগের পক্ষে শ্রেণীগত কারণেই সম্ভব ছিলো না। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের পর বাঙলাদেশের অধিবাসীরাই শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এখানে যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপিত হলো সে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ছিলো শোষক শ্রেণীরই রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সেই প্রতিনিধিত্বের কারণে তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের সব রকম সম্পত্তি

স্বার্থ সম্প্রসারণ ও সুরক্ষা করতে নিযুক্ত হয়েছিলো। এ কাজ করতে দাঁড়িয়ে তারা উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে এমন কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি যেটা পাকিস্তানী আমলের উৎপাদন সম্পর্ক থেকে মৌলিকভাবে পৃথক ছিলো। বরং পাকিস্তান আমল থেকে প্রাপ্ত সম্পর্কগুলিকে বহাল রেখে তার মধ্যে অনেক বিশৃংখলা তারা সৃষ্টি করেছিলো এবং সারা দেশে জারী করেছিলো এক লুণ্ঠনের রাজত্ব।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা যে দ্রুত কমে আসবে এবং জনগণের ব্যাপকতম অংশের সাথে তাদের একটা বিচ্ছিন্নতা ঘটতে থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। এবং সেই স্বাভাবিক ব্যাপারটিই ১৯৭৩ সাল থেকেই ঘটতে শুরু করেছিলো।

ভূমি সংস্কার, শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক, ব্যবসা ক্ষেত্রে বিদ্যমান রীতি নীতি ইত্যাদিতে কোন প্রকৃত পরিবর্তন আনা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানী মালিকানাধীন এবং পাকিস্তান আমলে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে যে বাঙালী শিল্প বাণিজ্য স্বার্থ গড়ে উঠেছিলো সেগুলিসহ যাবতীয় শিল্প বাণিজ্য জাতীয়করণ করে আওয়ামী লীগ সব কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে এলেও পুঁজির সাথে শ্রমের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। উপরন্তু সমাজতন্ত্রের কথা বললেও আমলা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন পুঁজি শ্রমিকদেরকে আগের থেকে বেশী মাত্রায় শোষণ করছিলো।

এই শোষণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগকে ব্যাপকভাবে নির্যাতনের আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। শুধু যে তারা হাজার হাজার বামপন্থী কর্মী ও তাদের রাজনীতির সমর্থকদেরকে হত্যা করেছিলো তাই নয়। রক্ষী বাহিনী, লাল বাহিনী ইত্যাদি নানা ধরনের ঠেঙাড়ে বাহিনীর মাধ্যমে তারা হত্যার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের বাড়ীঘরে আগুন দেওয়া, বিপুল সংখ্যায় তাদেরকে গ্রেফতার করা, সব রকম অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে প্রগতিশীল রাজনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার এক গণবিরোধী নীতি তারা খুব সচেতনভাবে কার্যকর করে চলেছিলো। আওয়ামী লীগের এই শোষণ নির্যাতন, দমন পীড়ন এবং প্রগতিশীল ও বাম রাজনীতি বিরোধিতাকে বাদ দিয়ে অথবা সে বিষয়টি বিবেচনা না করে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বোঝা অথবা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ যে কারণে তারা শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের উপর নির্যাতন করছিলো ঠিক সে কারণেই তারা ১৯৭১ সালের রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌স, এবং ঘাতক দালালদের প্রতি, সব রকম প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি তাদের নীতিকে নমনীয় করছিলো। আওয়ামী লীগের শ্রেণীগত চরিত্রের মধ্যে যে মৌলিক প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিলো সেটা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিছুটা দমিত থাকলেও ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের সে চরিত্র পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় এবং তার ফলে তারা শ্রেণীগত ঐক্যের কারণেই জামাতে ইসলামীসহ সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থাতেই এদেশে মাদ্রাসাগুলি উঠিয়ে সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক এবং গণতান্ত্রিক পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা না করে সেগুলিকে টিকিয়ে রাখার পূর্ব ব্যবস্থাই বহাল থাকে। শুধু তাই নয়, সে সময় মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা এবং মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই করা হয়। সারা দেশে একই ধরনের বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক পাঠক্রম প্রবর্তন করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার প্রসার বন্ধের যে দাবী দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি প্রধান দাবী ছিলো সে দাবী এভাবেই আওয়ামী লীগের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে পরবর্তীকালে এগুলি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম ব্যবসায়ীদের দুর্গ হিসেবে ব্যবহারের পথই প্রশস্ত করা হয়।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় কিভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রতি ক্রমশঃ নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি পরিবর্তন করছিলো তার উদাহরণ হিসেবে সরকারীভাবে গণভবনে মিলাদ অনুষ্ঠানে এবং টেলিভিশন, রেডিওতে 'খোদা হাফেজ' ইত্যাদি বলা নোতুনভাবে শুরু করার বিষয়গুলিও উল্লেখ করা দরকার। আপাতঃদৃষ্টিতে এগুলিকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও রাজনৈতিকভাবে এ বিষয়গুলি বিচার করলে এসব পরিবর্তনকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণই মনে হবে। এই গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করলে সহজেই বোঝা যাবে কিভাবে ধাপে ধাপে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ঘটিত পরিস্থিতির অবনতি হতে হতে এক পর্যায়ে এসে গোলাম আজমের পক্ষে প্রকাশ্যে জামাতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

সামরিক কর্তাব্যক্তি জিয়াউর রহমানের সময়ে জামাতে ইসলামীকে প্রকাশ্যে এবং আইনসঙ্গতভাবে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। অর্থাৎ সে সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় দলসহ জামাতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যে আইনগত নির্দেশ জারী করা হয়েছিলো সে আইন প্রত্যাহার করা হয়। জিয়াউর রহমান কর্তৃক এইভাবে জামাতে ইসলামীকে প্রকাশ্য কাজের অনুমতি প্রদানের সঙ্গে পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের নীতির কোন পার্থক্য ছিলো না। উপরন্তু জিয়াউর রহমানের এই কাজের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ধর্মীয় রাজনীতি সম্পর্কিত পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতাই রক্ষিত হয়েছিলো।

রাজাকার, আলবদরদেরকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে, তাদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে সব রকম পরোয়ানা প্রত্যাহার করে, তাদের প্রতি দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলো সে পরিস্থিতিতে খোন্দকার মুশতাক কর্তৃক তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী সরকারের আমলে দালাল আইন বাতিল এবং জিয়াউর রহমান কর্তৃক সাধারণভাবে ধর্মীয় রাজনীতি এবং বিশেষভাবে জামাতে ইসলামীর রাজনীতিকে প্রকাশ্যে সক্রিয় হতে দেওয়ার আইনগত অধিকার প্রদান ছিলো আওয়ামী লীগের নীতিরই অপ্রতিরোধ্য যৌক্তিক পরিণতি। শেখ মুজিবুর রহমান যদি ১৯৭৫ সালে নিহত না হতেন এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে

উৎখাত না হতো তা হলে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারই ধর্মীয় রাজনীতি বাঙলাদেশে প্রকাশ্যে চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে খোন্দকার মুশতাক ও জিয়াউর রহমানের মতোই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতো।

এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার সেটা হলো এই যে, এদেশের শাসকশ্রেণী এবং তাদের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষক মার্কিনসহ সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জনগণ থেকে যতই বিচ্ছিন্ন হচ্ছে এবং জনগণ তাদেরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার মতো পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে ততই বেশী করে এদেশে দেখা দিচ্ছে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার।

এ প্রসঙ্গে 'বাঙালী বনাম বাঙলাদেশী' জাতীয়তাবাদের বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। বিশেষ করে এটা দরকার এ কারণে যে, কিছুদিন থেকে কিছু সংখ্যক আওয়ামী-বাকশালী বুদ্ধিজীবী এমনভাবে এ বিষয়ে নানা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থিত করছেন যার থেকে মনে হতে পারে যে, এদিক দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং জিয়াউর রহমানের বাঙলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি.)-এর কোন ধরনের অথবা মৌলিক কোন পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য যে মোটেই নেই এটা ভালোভাবে বোঝাবার জন্য আমার এ সম্পর্কিত বক্তব্য আমার পূর্ব প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির মাধ্যমেই এখানে আমি উপস্থিত করবো। কারণ 'বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি' নামক এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭২ সালের ২০শে ডিসেম্বর এবং পরে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে *'যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ'* নামক প্রবন্ধ-সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিলো যখন জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কোন প্রশ্নই ছিলো না। ১৯৭২ সালে বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি আওয়ামী লীগের নিজস্ব অবস্থানের ভিত্তিতেই তখন আলোচিত হয়েছিলো। কাজেই তখনকার এই লেখাটি থেকে উদ্ধৃতি দিলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, পরবর্তী সময় জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদকে একটি সাম্প্রদায়িক ব্যাপার হিসেবে জনগণের কাছে উপস্থিত করার ব্যাপারটিও ছিলো আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী চিন্তারই সম্প্রসারণ ও বিকশিত রূপ এবং সেই চিন্তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর প্রকাশিত 'বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি' নামক উপরোক্ত প্রবন্ধটিতে আমি এ প্রসঙ্গে বলেছিলাম, "মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি উপমহাদেশে সংগঠিত হয়েছিলো তার পরিণতিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিলো—ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রে। পাকিস্তানের পূর্বাংশ পূর্ব বাঙলায় ১৯৪৭ সালের পর থেকেই দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করে, তার বিরোধিতার ভিত্তিতে যে রাজনীতি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছিলো তারই পরিণতিতে পূর্ব বাঙলা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙলাদেশ নামক এক নোতুন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এই নোতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা বলছেন যে, বাঙলাদেশীরা একটি জাতি এবং সে হিসেবে বাঙলাদেশ একটি জাতীয় রাষ্ট্র।

"বাঙলাদেশীদেরকে একটি জাতি এবং বাঙলাদেশ রাষ্ট্রকে একটি জাতীয় রাষ্ট্র বলে যারা মাঠে ময়দানে, রেডিও-টেলিভিশনে এবং পত্রপত্রিকায় সোরগোল তুলেছেন তাঁরা কিন্তু পূর্বতন পূর্ব বাঙলায় এই মানব গোষ্ঠীর জাতীয়তার ভিত্তি সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। তাঁরা মনে করছেন বাঙলাদেশীরা অর্থাৎ পূর্ব বাঙলার অধিবাসীরা একটি জাতি এই কথা বারংবার উচ্চারণ এবং প্রচার করলেই কাজ হাসিল হবে। এই অঞ্চলের লোকেরা নিজেদেরকে একটি স্বতন্ত্র 'জাতি' হিসেবে ধরে নিয়ে বাঙলাদেশকে একটি "জাতীয় রাষ্ট্র" হিসেবে গঠন করার উদ্দেশ্যে জানমাল কোরবান করবার জন্যে প্রস্তুত হবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, বিষয়টি অতি সহজ অথবা সরল নয়।

"পূর্ব বাঙলায় দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলা হয়েছিলো ভাষার কথা, ঐতিহ্যের কথা, ইতিহাসের কথা। এই সমস্ত বলে দেখানো হয়েছিলো পাকিস্তানের মুসলমানেরা সকলে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা সকলে এক জাতিভুক্ত নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে পূর্ব বাঙলার জনগণের "জাতিগত" পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে মোটামুটিভাবে যে বক্তব্য দাঁড়িয়েছিলো তা হলো এই যে, বাঙালী নামে একটি স্বতন্ত্র জাতি আছে যার ভাষা বাংলা, যার ঐতিহ্যের অন্তর্গত হলো রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মোশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম; হাজার বছরের যে বাঙালী সংস্কৃতি সে সংস্কৃতি পশ্চিম বাঙলার জনগণের যেমন পূর্ব বাঙলার জনগণেরও ঠিক তেমনি।

"এখন যাঁরা বর্তমান বাঙলাদেশের অর্থাৎ পূর্ব বাঙলার অধিবাসীদেরকে একটি জাতি আখ্যা দিয়ে বাঙলাদেশকে একটি জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন তাঁরা তাঁদের জাতীয়তাবাদকে কোন ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবেন? যে ভিত্তির ওপরই তাঁরা তাকে দাঁড় করান একটি জিনিস তাঁদেরকে করতেই হবে। পশ্চিম বাঙলার জনগণের সাথে এক্ষেত্রে "জাতি" হিসেবে তাঁদের পার্থক্যকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হবে...

"আর্থিক জীবনে চব্বিশ বৎসরে পূর্ব বাঙলার জনগণের জীবনে কি এমন পরিবর্তন ঘটেছিলো যার ফলে হাজার বৎসরের ঐতিহ্যওয়ালা একটি মানবগোষ্ঠী নিজেরাই অন্য একটি অংশ থেকে আজ এতোখানি পৃথক হয়ে গেলো, যার ফলে তারা পরিণত হলো একটি জাতিতে?...এদিক দিয়ে বিচার করলে ১৯৪৭ সালে পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব বাঙলার মধ্যে যে পার্থক্য ছিলো বর্তমান পার্থক্যের ক্ষেত্রে তার মধ্যে এমন কোন বৈপ্লবিক তারতম্য ঘটেনি।

"আর একটি কথা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আমরা জানি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও চক্রান্তের ফলে জার্মানী, কোরিয়া ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। এই সব দেশের দুই অংশে দুই ধরনের পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিম অথবা পূর্ব জার্মানী, উত্তর অথবা দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর অথবা দক্ষিণ ভিয়েতনাম এদের কোনটিই নিজেকে পৃথকভাবে 'জাতি' হিসেবে ঘোষণা করেনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে

বিরাট তারতম্য, মৌলিক প্রভেদ সত্ত্বেও পৃথক জাতিসত্তার প্রশ্ন ঐ সমস্ত দ্বিধাবিভক্ত দেশে ওঠেনি। কিন্তু বাঙলাদেশে আজ তা উঠেছে।

"যাই হোক, এবার সংস্কৃতির প্রশ্নটি বিবেচনা করা যেতে পারে। পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে ২৪ বৎসর কি এমন পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে এক হাজার বৎসরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে পূর্ব বাঙলার অধিবাসীরা এমন এক জাতিসত্তার অধিকারী হয়েছে যা পশ্চিম বাঙলার জনগণের জাতিসত্তার থেকে স্বতন্ত্র?...এবার সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের প্রশ্নটিতে আসা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ব বাঙলার সমাজের উচ্চ স্তরে, শাসন-শোষণ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দুদের প্রাধান্যের পরিবর্তে মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন না ঘটলেও জনগণের আর্থিক জীবন যারা নিয়ন্ত্রণ করতো, ব্যাপক অর্থে সমাজকে যারা শাসন করতো, তাদের সম্প্রদায়গত চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। একমাত্র এই সম্প্রদায়গত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চব্বিশ বৎসরে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এক্ষেত্রেই পশ্চিম বাঙলার সাথে পূর্ব বাঙলার একটি স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।...

"এই সম্প্রদায়গত পরিবর্তনই কি তাহলে বাঙলাদেশী জাতীয়তার ভিত্তি নয়? এই জাতীয়তার ভিত্তির ওপরেই কি মুজিববাদের প্রতিষ্ঠা নয়? একমাত্র এই ভিত্তিতেই কি আজকের বাঙলাদেশের অধিবাসীরা পশ্চিম বাঙলার অধিবাসীদের থেকে স্বতন্ত্র নয়?

"তা যদি হয়, তাহলে বাঙলাদেশের জাতীয়তার ধ্বনি তোলা, জাতীয় রাষ্ট্রের জিগীর তোলার অর্থ কি জাতীয়তাকে আবার নোতুন করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা নয়?

"জার্মানী কোরিয়া ভিয়েতনামের দুই অংশে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথক জাতিসত্তার প্রশ্ন উত্থাপনের কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু বাঙলাদেশের শাসক দল সে প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেছেন। এবং একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, এই বাঙলাদেশী জাতীয়তার ভিত্তি মূলতঃ সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব ব্যতীত কিছুই নয়। তাই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতবর্ষের মুসলিম প্রধান দুই অংশে দুটি 'মুসলিম রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার যে কথা বলা হয়েছিল বস্তুতঃপক্ষে মুজিববাদের নামে আজ বাঙলাদেশে সেটাই কার্যকর হয়েছে।"

বাঙালী ও বাঙলাদেশী প্রশ্নের উপর আমি পরে একাধিক প্রবন্ধ লিখলেও উপরোক্ত প্রবন্ধটি থেকেই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ এটা বিশেষভাবে দেখানো যে, বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদের ব্যাপারটি জিয়াউর রহমানের সময়েই হঠাৎ করে সরকারী কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা সামনে নিয়ে আসা হয়নি। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, বাঙলাদেশী জাতীয়তার যৌক্তিক পরিণতিই হলো বাঙলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণা অথবা ইসলামকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর যে বাঙালীরা এখানে শাসন ক্ষমতা দখল করে শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করতে লাগলো এবং নিজেদের দ্বারা পরিচালিত শোষণ ব্যবস্থাকে নোতুনভাবে সংগঠিত করতে থাকলো তারা ক্রমশঃ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন বিশাল ধনসম্পত্তির মালিকে পরিণত হচ্ছিলো তেমনি তারা উত্তরোত্তর বিচ্ছিন্ন হচ্ছিলো জনগণের থেকে।

পাকিস্তানীদের পরিবর্তে নিজেরা সব রকম সম্পত্তি মালিকে পরিণত হওয়ায় কোন মৌলিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী জনগণের সামনে হাজির করা এবং তার ভিত্তিতে জনসমর্থন লাভ তাদের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় আওয়ামী-বাকশালী আমল থেকেই তারা জনগণের পশ্চাৎপদ চেতনাকে আশ্রয় করেই জনগণের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছিলো। শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্যোগগুলি নিতে শুরু করলেও দ্রুতগতিতে পুরোপুরি ভোল পাল্টানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এ কারণে তারা সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের যে ভিত্তি নিজেদের রাজনীতি এবং সংবিধানে স্থাপন করেছিলো জিয়াউর রহমান তার উপর দাঁড়িয়েই বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদকে একটা প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রদান করেছিলেন।

এ দিক দিয়ে ধারাবাহিকতার অন্যান্য উদাহরণও আছে। যেমন আওয়ামী লীগ আমলে রেডিও টেলিভিশনে 'খোদা হাফেজ' বলা এবং গণভবনে সরকারীভাবে মিলাদ অনুষ্ঠানেরই যৌক্তিক পরিণত ঘটে জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাঙলাদেশের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' ইত্যাদি সংযোজন। আওয়ামী-বাকশালী রাজনীতিবিদ এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাদের সহযোগী বুদ্ধিজীবীরা এখন বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ, সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন ইত্যাদি নিয়ে শোরগোল তুললেও আওয়ামী-বাকশালী আমলের সাম্প্রদায়িক নীতির সঙ্গে এক্ষেত্রে পরবর্তী আমলের ধারাবাহিকতা অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। শুধু তাই নয়, এই ধারাবাহিকতার এই পর্যায়ে জামাতে ইসলামী তার রাজনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে পেরেছে এবং শেষ পর্যন্ত গোলাম আজমকে তাদের আমীর হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

এরশাদের সামরিক শাসন আমলে কয়েকটি বিষয় এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্রথমতঃ, এরশাদ বিরোধী পাঁচ দফা আন্দোলনের সময় ১৫ দল ও ৭ দল এবং পরে এক দফা আন্দোলনের সময় ৮ দল, ৭ দলের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর এক অঘোষিত আঁতাত। সে সময় তিন জোটের মধ্যকার লিয়াজোঁ কমিটির মতো কোন প্রকাশ্য কমিটিতে জামাতে ইসলামী ছিলো না। কিন্তু প্রকাশ্যে না থাকলেও উপরোক্ত দল ও জোটগুলির সঙ্গে জামাতের একটি অঘোষিত লিয়াজোঁ ছিলো যার মাধ্যমে তারা সকলে একত্রে যুগপৎ আন্দোলন এবং একই দিনে ও সময়ে একই কর্মসূচী ঘোষণা করতো। এই আধা প্রকাশ্য আঁতাত চলাকালীন সময়ে উপরোক্ত দল ও জোটগুলির মুখপাত্রেরা জামাতকে একটি গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। উপরন্তু 'গণতান্ত্রিক শক্তি' হিসেবে জামাতে ইসলামীর সঙ্গে নিজেদের আঁতাতকে তাঁরা যুক্তিসঙ্গত করার চেষ্টা করেছিলেন।

এ ক্ষেত্রে যুক্তি একটি অবশ্যই ছিলো যে যুক্তিটির সঙ্গে গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক ছিলো না। উপরন্তু সম্পর্ক ছিলো গণতন্ত্র বিরোধিতার এবং জনগণের মধ্যে বিরাজমান পশ্চাৎপদ চেতনাকে সাধারণ শ্রেণীগত রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের। এই শ্রেণীগত ঐক্যই ছিলো তিন জোটের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর আন্দোলনগত ঐক্যের আসল ভিত্তি।

একথা বলা ভুল হবে না যে, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাতে ইসলামীই লাভবান হয়েছিলো সব থেকে বেশী। কারণ তারা জিয়াউর রহমানের আমলে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি পেলেও জনগণের মধ্যে, বিশেষতঃ মধ্যবিত্তের মধ্যে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব সে সময় ছিলো না। তিন জোটের সহযোগিতার মাধ্যমেই তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী অপাঙক্তেয় চরিত্রের কালিমা মুছে ফেলে মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলো। অন্যদিকে ধর্ম প্রচারের নামে ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে তারা জনগণের পশ্চাৎপদ ধর্মীয় চেতনাকে রাজনৈতিক কাজে এ সময়েই খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে নিযুক্ত হয়েছিলো। এভাবে তারা কিছুতেই অগ্রসর হতে পারতো না যদি তারা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনটি বুর্জোয়া জোটের ও জোটভুক্ত দলগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আন্দোলন করার সুযোগ লাভ না করতো।

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচনপন্থী তিন জোটভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই নির্বাচনের সময়ে মিটিং-মিছিল পোস্টার লিফলেটে ধর্মকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে এবং তাদের দ্বারা ধর্মের এই রাজনৈতিক ব্যবহার জামাতে ইসলামীর রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। বি.এন.পি. আওয়ামী লীগ ইত্যাদি দলের তো কথাই নেই, এমনকি কমিউনিস্ট নামধারী সিপিবি পর্যন্ত নির্বাচনের সময় ধর্মকে কুৎসিতভাবে ব্যবহার করতে নিযুক্ত থেকেছে। সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য অনেক প্রার্থী নিজেদের পোস্টারে 'আল্লাহু আকবার' লাগিয়ে ১৯৯১ সালের 'গণতান্ত্রিক' নির্বাচন করেছে। এ ছাড়া তাদের আরও ব্যাপার আছে। তাদের পূর্ববর্তী সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ ফারহাদের মৃত্যুর পর তারা নিজেদের অফিসে মিলাদের অনুষ্ঠানও করেছিলো! একটি পার্টি কমিউনিস্ট নামধারণ করা সত্ত্বেও তাদের এই আচরণ এদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকে কোন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে সেটা বোঝার কোন বিশেষ রাজনৈতিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় না।

বুর্জোয়া দল ও জোটগুলি দ্বারা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় এবং উত্তরোত্তরভাবে নানা অজুহাতে ধর্মের ব্যবহার এরশাদ কর্তৃক ইসলামকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার ব্যাপারেও শক্তি যুগিয়েছিলো। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির মধ্যে এই পরিবর্তন না ঘটলে এরশাদের পক্ষে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা যে একেবারেই সম্ভব ছিলো না সেটা বোঝার জন্যও কোন বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল কর্তৃক ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার যেভাবে হয়ে এসেছে সেটাই প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা এবং জামাতে ইসলামীকে এ দেশের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত করার ব্যাপারকে সম্ভব করেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর জনগণের সামনে কোন অগ্রসর কর্মসূচী উপস্থিত করতে শ্রেণীগতভাবে অপারগ হওয়ার কারণেই তাদেরকে জনগণের পশ্চাৎপদ চেতনার উপর নির্ভর করেই তাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে হচ্ছে। এদিক দিয়ে জামাতে ইসলামীর রাজনীতি ও অপরাপর বুর্জোয়া দলগুলিকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে, যদিও জামাত কর্তৃক ইসলামের ব্যবহারের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ও বিশেষত্ব আছে।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জামাতে ইসলামী এবং অন্য রাজনৈতিক দলগুলি বর্তমান বাঙলাদেশে যেভাবে ধর্মকে ব্যবহার করছে তার চরিত্র সাম্প্রদায়িক নয়। হিন্দু অথবা অপর কোন ধর্মের বিরুদ্ধে জিগীর তুলে তারা ধর্মের এই ব্যবহার করছে না। জামাত ছাড়া অন্য দলগুলি ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করছে সাধারণভাবে। ধর্মের প্রতি নমনীয় ভাব প্রদর্শন, দোয়া, প্রার্থনা, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমেই তারা জনগণকে বোঝাতে চাইছে যে তারা ধর্মভীরু, ধর্মীয় ভাবধারার দ্বারা তারাও অনুপ্রাণিত কাজেই তারা "ধর্মভীরু" জনগণের ভোট পাওয়ার যোগ্য।

জামাতের ব্যাপার এদিক দিয়ে একেবার স্বতন্ত্র। তারা ধর্মকে সরাসরি ব্যবহার করছে সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদ, মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন মাও এবং সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিরুদ্ধে। এদিক দিয়ে তাদের দ্বারা ধর্মের ব্যবহারের লক্ষ্য খুব স্পষ্টভাবে প্রগতিশীলতা ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই লক্ষ্যের শ্রেণী চরিত্র শ্রমজীবী জনগণের—কৃষক, শ্রমিকসহ সকল প্রকার শ্রমজীবীর স্বার্থের সরাসরি ও সম্পূর্ণ বিরোধী।

জামাতে ইসলামী ছাড়া অন্য যারা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করছে তারা জামাতের চরিত্রের এই দিকটিকে আড়ালে রাখার চেষ্টায় জামাতে ইসলামীকে একটি সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে জনগণের কাছে উপস্থিত করছে। একাজও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ এর দ্বারা জামাতে ইসলামীর কিছুটা বিরোধিতা করা হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রকৃত রূপ এবং চরিত্র সঠিকভাবে উত্থাপিত হয় না। সেটা উদঘাটন করাও এই সব রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য নয়। কারণ তারা সকলেই ধর্মের এই ব্যবহার পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের প্রয়োজনমতো করছে।

জামাতে ইসলামী যে মুসলিম লীগের মতো একটি সাম্প্রদায়িক দল নয় সেটা জামাতে ইসলামীর প্রচার কাজ এবং অন্যান্য তৎপরতার দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়। একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের নিজের প্রচার কাজে সব সময়েই অন্য সম্প্রদায় এবং অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই হলো আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু। এ কারণে মুসলিম লীগ কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকে এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মুসলিম লীগকে প্রতিপক্ষ হিসেবেই আক্রমণ করতো। জামাতে ইসলামীর এ ধরনের আক্রমণের কোন লক্ষ্যবস্তু নেই। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সমাজতন্ত্র এবং সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা।

ব্যাপকভাবে প্রচার কাজ সংগঠিত করার একটি উপায় হিসেবে তারা অসংখ্য ক্যাসেট তৈরী করে বাজারে বিক্রি করছে এবং সভা সমিতিতে এমনকি নিজেদের লোকের মাধ্যমে বাস, মিনিবাস, কোস্টার ইত্যাদি পরিবহনে এই ক্যাসেটগুলি বাজানো হয়ে থাকে। এগুলির উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এগুলিতে যাদের বক্তৃতা রেকর্ড করা থাকে তারা ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী দর্শন এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। তাদের এই অজ্ঞানতা এবং শিক্ষার অভাব ক্যাসেটগুলির যেকোন শিক্ষিত শ্রোতার কাছে খুব সহজেই ধরা পড়বে। কিন্তু অশিক্ষিত হলেও দেলওয়ার হোসেন সাঈদী থেকে শুরু করে অন্যান্য ওয়াজ করনেওয়ালা এই ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মভীরু সাধারণ লোকদের নিকৃষ্টতম পশ্চাৎপদ চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ। এই দক্ষতা গ্রাম্য মোড়লের ধূর্ততার সঙ্গে তারা ব্যবহার করে 'ভক্ত' শ্রোতাদেরকে কাঁদিয়ে কাটিয়ে এবং অশিক্ষার অন্ধকারে আটকে রেখে নিজেদের হীনতম উদ্দেশ্য হাসিল করে। সাঈদীর মতো লোকেরা এইসব ওয়াজের উপলক্ষ্যে প্রতি বক্তৃতার জন্য হাজার হাজার টাকা ফি নিয়ে থাকে। দরিদ্র জনগণকে ধর্মের নামে এইভাবে ধোঁকা দিয়ে তারা নিজেরা একদিকে যেমন ধন সম্পত্তির মালিক হয়, তেমনি অন্যদিকে সাধারণভাবে সেই ধন সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্যও তারা বক্তৃতার মধ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করে। এই কৌশলের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে, শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে, নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের কুৎসিত অপপ্রচার।

জামাতে ইসলামীর প্রচার প্রচারণার এই ধরন এবং এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সাম্প্রদায়িক কোন দল নয়, তারা ধর্মের যে ধরনের রাজনৈতিক ব্যবহার মূলতঃ করে সে ব্যবহারকে সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সুযোগ জামাতে ইসলামীর লোকরা কখনো কখনো নিয়ে থাকলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতেও তারা দাঁড়ায়, যেমন তারা কিছু জায়গায় সেভাবে দাঁড়িয়েছিলো ১৯৯০ এর অক্টোবর-নভেম্বরে। তখন জামাতে ইসলামী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধেও বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচার করেছিলো। এ বিষয়ে ধারণা যদি পরিষ্কার না থাকে, জামাতে ইসলামীর চরিত্রের এই দিকটির প্রতি আসল মনোযোগ নিবদ্ধ না করে যদি তাকে শুধু "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী," "বাঙলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী" ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করে তার বিরোধিতা করা যায় তাহলে তার দ্বারা জামাতে ইসলামীর অবস্থান মোটেই দুর্বল হবে না, উপরন্তু তার বিরুদ্ধে এই ধরনের রাজনৈতিক আক্রমণ পরিণত হবে একটি প্রহসনে। এই প্রহসনই এখনকার বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির একটি অংশ এখন জামাত বিরোধিতার নামে করছে।

অতি সম্প্রতি জামাতে ইসলামীর মতো গোলাম আজমকে নিয়ে বাঙলাদেশে বিতর্ক এবং আন্দোলন বেশ জোরেশোরে হচ্ছে। এখানেও যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো গোলাম আজমকে শুধু "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী" "স্বাধীনতা বিরোধী," "যুদ্ধ

অপরাধী” ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, গোলাম আজমকে এমনভাবে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা হচ্ছে যাতে মনে হয় যে দেশ থেকে গোলাম আজমকে তাড়িয়ে দিলে অথবা কোনভাবে দেশ “গোলাম আজম মুক্ত” হলেই মূল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এই বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও কর্মসূচীর সঙ্গে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বেশ সাদৃশ্য আছে। সে সময়েও এরশাদের শ্রেণী প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রকে উপেক্ষা করে এবং আড়ালে রেখে তাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছিলো এবং বলা হয়েছিলো যে দেশ এরশাদ মুক্ত হলেই দেশের জনগণের মুক্তি লাভ হবে, অন্ততঃ দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। পাঁচ দফা আন্দোলনের পর এক দফা আন্দোলনের সময় বুর্জোয়াদের এই বিভ্রান্তিকর তৎপরতা একেবারে তুঙ্গে উঠেছিলো। শেষ পর্যন্ত নব্বুই-এর আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ উৎখাত হয়েছিলো কিন্তু তার ফলে জনগণের মুক্তি আসেনি, অথবা দেশে কোন গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একটি নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের খোলস পরে আর একটি স্বৈরতন্ত্রী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে লুণ্ঠনকারী বুর্জোয়াদের শোষণ শাসনকেই বহাল রেখেছে।

এর থেকে শিক্ষা নেওয়ার আছে। সে শিক্ষা নিলে সহজেই দেখা যাবে যে, গোলাম আজমের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র, তার শ্রেণী চরিত্রকে আড়াল করে এবং জামাতে ইসলামীর প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখে বিরাট বড় আন্দোলন গোলাম আজমের বিরুদ্ধে করলে এবং তাকে রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে উৎখাত করতে সক্ষম হলেও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শুধু তার দ্বারাই বন্ধ হবে না, এমনকি কমেও আসবে না।

এখানে অপর একটি প্রশ্নও উল্লেখযোগ্য। গোলাম আজমকে বাঙলাদেশ জামাতে ইসলামীর আমীর নির্বাচনের বিরোধিতা করে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি বলছে যে, গোলাম আজম বাঙলাদেশের নাগরিক নয়। কাজেই তার এই নির্বাচন বেআইনী। এ ক্ষেত্রে এই আইনের প্রশ্নটি নিয়ে টানাটানি করার অর্থই হচ্ছে এর মূল রাজনৈতিক চরিত্র থেকে সমগ্র বিষয়টিকে একটি আইনগত ব্যাপারে পরিণত করার চেষ্টা। অথচ গোলাম আজমের নির্বাচন এবং জামাতে ইসলামীর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল তৎপরতা কোন আইনগত সমস্যা নয়, তা হলো সর্বাংশে একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিকভাবেই তাকে দেখা দরকার।

জামাতে ইসলামীর যেহেতু একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী চরিত্র আছে, যেহেতু তার সমগ্র তৎপরতাই হচ্ছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শোষক শ্রেণীর স্বার্থে এক শ্রেণী সংগ্রাম সেজন্য তাকে প্রতিহত করতে হলে, তাকে এদেশের রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে, সেটা এক পাল্টা শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমেই করতে হবে। দেশীয় লুণ্ঠনকারী বুর্জোয়া শোষক শাসক শ্রেণীর ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী শ্রমিক কৃষক, পেশাজীবীসহ সকল প্রকার শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণী সংগ্রাম সংগঠিত করেই সম্ভব শুধু জামাতকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উৎখাত করা নয়, এদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারও সম্পূর্ণ বন্ধ করা।

এই শ্রমসাধ্য কষ্টসাধ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং দেশীয় শোষক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম ব্যতীত গোলাম আজম এবং জামাতে ইসলামীর বিরোধিতা করতে দাঁড়ানোর অর্থই হচ্ছে এদেশের রাজনীতির একটি মৌলিক ইস্যুকে একটি গৌণ ইস্যু, এমনকি ভুয়া ইস্যুতে পরিণত করা, বর্তমানে চারদিকে শ্রমিক ও পেশাজীবীদের যে সব আন্দোলন ব্যাপকভাবে ও জোরালোভাবে সংগঠিত হচ্ছে সে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করা এবং এইভাবে দেশীয় শোষক শাসক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের হাতকেই শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী করা, গোলাম আজম ও জামাতে ইসলামীকে পরাজিত করার নামে তার বিরোধিতা করতে গিয়ে তাকে জিতিয়ে দেয়া।

১৩.২.১৯৯২

সংস্কৃতি
ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

গোলাম আজম ও জামাতে ইসলামী প্রসঙ্গে

বাঙলাদেশ জামাতে ইসলামী সম্প্রতি গোলাম আজমকে তাদের সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করেছে। এই ঘটনার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে কিছুটা চাঞ্চল্য ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেছে।

গোলাম আজম বাঙলাদেশের নাগরিক নয়, এই যুক্তি দেখিয়েই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ আর অন্য কয়েকটি সংগঠন জোরালো বক্তব্য দেয়ার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রশ্নটিকেই তারা সামনে নিয়ে আসতে চাইছে।

জামাতের আমীর পদে গোলাম আজমের নির্বাচনে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ, জামাতের রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বেশ পরিকল্পিতভাবে শুধু বিএনপি নয়, আওয়ামী লীগও কাজ করে এসেছে। মুখে তারা মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক গালভরা কথা বলে এলেও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার তারা বহুদিন আগেই শুরু করেছে। রাজাকার আলবদরদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে তাদেরকে দেশ গড়ার কাজে আহ্বান জানাবার পর থেকে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। শেখ মুজিবুর রহমানের দেশগড়ার আহ্বান জানাবার সঙ্গে জামাতে ইসলামী কর্তৃক আইনসম্মতভাবে জিয়ার আমলে খোলাখুলি কাজ করার অধিকার লাভ সরাসরি সম্পর্কিত এবং তাদের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। একটি অপরটিরই যৌক্তিক পরিণতি। এই যুক্তির পথ ধরেই এখন গোলাম আজমের নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। ১৯৭১ সালে জামাতে ইসলামী এবং বহু সংখ্যক আলবদর, রাজাকার কর্তৃক জনগণের উপর সব রকম নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা, তাদেরকে দেশ গড়ার কাজে আমন্ত্রণ জানানো এবং পরবর্তীতে তাদেরকে আইনসম্মত করার পর নেতৃত্বের স্থানে গোলাম আজমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়।

এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ের আর একটি ঘটনারও উল্লেখ করা দরকার। বিগত প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের সময় বিএনপি প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাস এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী বদরুল হায়দার চৌধুরী গোলাম আজমের দোয়া (এবং সম্ভবতঃ পদধূলি) নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর বিএনপি তো নয়ই এমনকি আওয়ামী লীগও উক্ত নির্বাচন প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। মুক্তিযুদ্ধের নাম ভাঙ্গিয়ে খাওয়া এই দুই সংগঠনের বিশেষতঃ আওয়ামী লীগের এই আচরণ যে তাদের জামাত বিরোধিতা নয় উপরন্তু জামাতকে সহায়তাকারী তাতে

সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। আওয়ামী লীগ যদি সত্যিই জামাত বিরোধী হতো, গোলাম আজমের বিরোধী হতো, তাহলে বদরুল হায়দার চৌধুরী কর্তৃক গোলাম আজমের কাছে দোয়া ভিক্ষার পরে তারা তাঁর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করতো। কিন্তু তারা তা করেনি। এই না করার ব্যাপারটি তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে এটা ভালোভাবে বোঝা দরকার যে আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং সেই সঙ্গে কিছু বাম নামধারী সংগঠন যদি সত্যসত্যই জামাতের বিরোধী হতো তাহলে গোলাম আজমের পক্ষে জামাতের আমীর হওয়া তো সম্ভব হতোই না, উপরন্তু একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাতে ইসলামীর কোন সক্রিয় এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করাও সম্ভব হতো না। কিন্তু এ সবই সম্ভব হচ্ছে এবং পরিকল্পিতভাবে, ধাপে ধাপে জামাতে ইসলামও তার তৎপরতাকে এগিয়ে নিচ্ছে। গোলাম আজমের কাছে দোয়া প্রার্থনা এবং গোলাম আজমকে জামাতের আমীর নির্বাচন করার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। উপরন্তু এ দুটি ঘটনা খুবই সংগতিপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগসহ ঐ ধরনের সংগঠনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ইত্যাদির বুলি কপচানো সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ, বিএনপি ইত্যাদির মতো রাজনৈতিক দল এখন নানাভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করছে। এই ব্যবহার কমিউনিস্ট নামধারী একাধিক দলকেও করতে দেখা যায়। বিগত নির্বাচনে সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদকসহ তাদের অনেক নেতার পোস্টারেই 'আল্লাহু আকবার' লেখা হয়েছিলো।

এই ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েই জামাতের বিকাশ, স্পর্ধার বৃদ্ধি এবং শেষ পর্যন্ত জামাতের আমীর হিসেবে গোলাম আজমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ কারণে গোলাম আজমের ব্যাপারটিকে কোন এক ব্যক্তির ব্যাপার হিসেবে না দেখে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে সেই প্রক্রিয়াটিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। সেটা না করলে ব্যক্তি গোলাম আজমকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ইত্যাদি রাজনৈতিক দল যে ভুয়া ইস্যু নিয়ে বাজার মাত করতে চাইছে সে কাজে তারা সফল হবে।

জামাতে ইসলামী এমন একটা চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী রাজনৈতিক দল যারা এ দেশের রাজনীতিতে সব থেকে বেশী ধর্মের ব্যবহার করছে। কিছু সেটা করলেও তাদের ভূমিকা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নয়। তাদের সঙ্গে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ইত্যাদি দলও আছে। আছে এজন্য যে শ্রেণীগতভাবে তারা সকলেই একই চরিত্রের, তারা প্রত্যেকেই হলেন শোষক শাসকশ্রেণীর এবং সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধি। তাদের এই অভিন্ন শ্রেণী চরিত্রের জন্যই তারা আজ এক সাধারণ সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক বাহ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও একথা সত্য। এবং সত্য বলেই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার তারা নানাভাবে করছে। তাছাড়া লোক ঠকানোর জন্য এ প্রকৃত ইস্যুর পরিবর্তে ভুয়া ইস্যু অবলম্বন করে তারা আন্দোলনের নানা মহড়া দেবার চেষ্টা করছে। খাল কাটা, ইনডেমনিটি বিল নিয়ে মাতামাতি, গোলাম আজমকে একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত করে তার বিরোধিতা করা ইত্যাদি হলো এ সবের এক একটি উদাহরণ।

এ ধরনের চেষ্টা করতেও তারা আজকের পরিস্থিতিতে বাধ্য কারণ কোন প্রকৃত অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হওয়ার লক্ষণ তাদের নেই। সেটা করলে তাদের নিজেদের স্বার্থের উপরই বড়ো আঘাত পড়বে। কোন গ্রাহ্য রাজনৈতিক ইস্যুও নেই তাদের সামনে। এই পরিস্থিতি তাদের জন্য খুবই সংকটজনক এবং এর মধ্যে তাদের দলগত ও শ্রেণীগত ধ্বংসের বীজ নিহিত রয়েছে।

এই পরিস্থিতি একমাত্র তাদের জন্যই অনুকূল যারা শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত ইস্যুগুলো, তাঁদের অধিকারের দাবীগুলোকে সামনে নিয়ে এসে সংগ্রাম করতে দাঁড়াবেন এবং সেই সংগ্রামের সঠিক কর্মসূচী ও পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

কাজেই এই প্রেক্ষিতে গোলাম আজমের প্রশ্নটি কোন ব্যক্তির ব্যাপার বা শুধুমাত্র জামাতে ইসলামীর ব্যাপার মনে করে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে হবে না। গোলাম আজমরা যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত সকল শক্তির বিরোধিতাই এখন করতে হবে। তাদের পারস্পরিক যোগসূত্রগুলো উদ্‌ঘাটন করে জনগণকেও সে বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

কোন নির্দিষ্ট আদালতে গোলাম আজমের বা অন্য অনেক ঘাতক নেতার বিচার হওয়া কার্যতঃ সম্ভব নয়। গোলাম আজমদের বিচার অবশ্যই হবার দরকার কিন্তু সে বিচার হতে হবে জনগণের আন্দোলনের ও সংগ্রামের আদালতে। শ্রমজীবী জনগণের ক্ষমতা অর্জন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের থেকে জামাত বিরোধী আন্দোলন একেবারেই বিচ্ছিন্ন নয়। উপরন্তু ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। এই চেতনার বিকাশই জনগণের মধ্যে ঘটাতে হবে। একমাত্র এভাবেই সম্ভব আমাদের দেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক অবস্থান বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন করা।

২১.১.১৯৯২

সাপ্তাহিক দিকচিহ্ন
২৩ জানুয়ারী ১৯৯২

জামাতে ইসলামীর প্রতি আহ্বান ঃ "রমজানের পবিত্রতা" রক্ষার জন্য আপনারা সোনারগাঁও, শেরাটন, পূর্বাণী হোটেল বন্ধ রাখার আন্দোলন করুন

বাঙলাদেশের নির্বাচিত "গণতান্ত্রিক" সরকার রমজানের মাসে হোটেল-রেস্তোরাঁ দিনের বেলা বন্ধ রাখার জন্য ২রা মার্চ এক নির্দেশ জারী করেছেন। এ কাজ পূর্ববর্তী এরশাদের সামরিক-স্বৈরতন্ত্রী সরকার যেভাবে করতো ঠিক সেভাবেই তাঁরা করেছেন। খুবই স্বাভাবিক। কারণ স্বৈরতন্ত্রী চরিত্রের দিক থেকে সামরিক সরকার এবং এই নির্বাচিত "গণতান্ত্রিক" সরকারের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আগের মতো এদের আমলেও দেশে স্বৈরতন্ত্রের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি একইভাবে বজায় রয়েছে।

এতো গেলো সরকারের কথা। এছাড়া আছে এদেশের ধর্মের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ব্যবহারকারী দল জামাতে ইসলামী। বেসরকারীভাবে তারাও "রমজানের পবিত্রতা" রক্ষার নামে নানা ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই তৎপরতার মধ্যে বক্তৃতা বিবৃতি মিছিল, দেওয়াল লিখন, মসজিদের জমায়েত, ওয়াজ-মাহফিল ইত্যাদি সবকিছুই আছে। কিন্তু শুধু নিরীহভাবে নিজেদের বক্তব্য প্রচারই নয়, "রমজানের পবিত্রতা" রক্ষার জন্য আগের বছরগুলিতে তারা যেভাবে হোটেল রেস্তোরাঁর ওপর দিনের বেলা হামলা করেছে এবারও সেটাই করার হুমকি প্রদান করছে। এই হুমকি এক বড়ো ধরনের জোর-জবরদস্তি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

'লা ইকরাহা ফিদদীন। কাদতাবাইয়ানার রুশদো মিনাল গাইয়ে'—কোরানের এই কথা উদ্ধৃত করে তারা প্রায়ই বলে থাকে যে, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। অন্ধকার থেকে আলো নিজের মাহাত্ম্যেই বেরিয়ে আসবে।" কিন্তু কোরানের এই কথাও যে তারা ভণ্ডামীপূর্ণভাবে ব্যবহার করে সেটার একটা বড়ো প্রমাণ হলো, রমজানের সময় খাওয়ার দোকান দিনের বেলা খোলা রাখলে সেগুলির ওপর চড়াও হওয়া এবং যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে না অথবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তাদেরকে রোজা রাখতে বা উপোস থাকতে বাধ্য করা।

পাকিস্তান আমলেও সরকার এবং জামাতে ইসলামীর পক্ষে এই ধরনের কোন নির্দেশ জারী অথবা জোর-জবরদস্তি করা সম্ভব হয়নি। কারণ ক্ষমতাসীন অবাঙালী মুসলমানরা তখন বাঙালী মুসলমান জনগণের উপর ধর্মের নামে এই ধরনের নির্যাতন করতে সাহস করতো না। কিন্তু এখন বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে মুসলমান বাঙালীদের হাতে

ক্ষমতা আসায় তারা বেশ বেপরোয়াভাবেই ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার নামে বাঙালী জনগণের উপর এই নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তান আমলে দিনের বেলা খাওয়ার দোকান খোলা থাকতো কিন্তু যারা সেগুলিতে খেতো তারা রোজাদারদের প্রতি খেয়াল রেখে পর্দার আড়ালেই খাওয়া-দাওয়া করতো। হোটেল রেস্তোরাঁগুলিতেও সে সময় দিনের বেলা পর্দা ঝুলতো। এইভাবে দোকান খোলা রাখলে তাতে কেউ আপত্তি করতো না। সেই ব্যবস্থায় "রমজানের পবিত্রতা" ক্ষুণ্ন হচ্ছে এ কথাও কেউ ভাবতো না। কিন্তু ধনিক শ্রেণীর বাঙালীদের হাতে ক্ষমতা আসার পর, এখন সেভাবে দিনের বেলা খাবার দোকান খোলা রাখলে "ইসলামের অবমাননা" হয় এবং "রমজানের পবিত্রতা" বিনষ্ট হয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এইভাবে "রমজানের পবিত্রতা" নষ্ট হয় শুধু দরিদ্র অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প সঙ্গতি সম্পন্ন লোকেরা ছোটখাট ও সস্তা হোটেল-রেস্তোরাঁয় দিনের বেলা খাদ্য গ্রহণ করলে। ধনী লোকেরা যখন পাঁচতারা, চারতারা, তিনতারা হোটেলে দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া এবং সেই সঙ্গে মদ্যপান ইত্যাদি করে তাতে "রমজানের পবিত্রতা" নষ্ট অথবা "ইসলাম ধর্মের কোন অবমাননা" হয় না। কারণ দরিদ্রের জন্য যা প্রযোজ্য ধনিকদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। এদিক দিয়ে সরকারী কর্তৃত্ব এবং জামাতে ইসলামের মতো "ইসলামের পাবন্দ" রাজনৈতিক দলের কোন পার্থক্য নেই।

জামাতে ইসলামী আজকাল শুধু আল্লাহর আইন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম ইত্যাদির কথাই নয় ভোটের দিকে খেয়াল রেখে এবং জনগণের চেতনার স্তরের কথা বিবেচনা করে গণতন্ত্রের কথাও বলে থাকে। এ কাজ তাদেরকে করতে হচ্ছে এ কারণে যে, শুধু ইসলামের কথা বলেই এদেশে আর রাজনীতি করা যাচ্ছে না। কাজেই ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা এদেশে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান শুরু করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরানের পরমতসহিষ্ণুতার যে কথা গৌরবের সঙ্গে তারা প্রচার করে, সেই কথা ও নীতি অনুযায়ীই নিজেদের ধর্ম পালনের অজুহাতে অন্য ধর্মাবলম্বী অথবা ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর নির্যাতন করা চলে না। কিন্তু "রমজানের পবিত্রতা" রক্ষার কথা বলে সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এ কাজটিই করছে।

ছোটখাট হোটেল-রোস্তোরাঁ অথবা ফুটপাতের খাওয়ার দোকানগুলিতেই খেটে-খাওয়া মানুষ, আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ী নেই এমন লোক যারা বিভিন্ন এলাকায় কাজের জন্য সফরে যান তাঁরা এবং অন্য ধর্ম ও মতাবলম্বী লোকেরা আহার করে থাকেন। এঁরা দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া করলে কিভাবে ইসলাম ধর্মের অবমাননা হয় এবং রমজানের পবিত্রতা বিনষ্ট হয় এ কথা যুক্তির দ্বারা বোধগম্য নয়। আসলে সেটা বোধগম্য হওয়ার কথাও নয়। কারণ এর মধ্যে কোন গ্রাহ্য যুক্তি নেই।

ইসলাম বা অন্য কোন ধর্মে যাদের বিশ্বাস নেই তাঁরা ভালোভাবেই জানেন এবং

প্রকৃত ধর্ম পালনকারীরাও জানেন যে, ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার আসল অর্থ হলো, নিজেরা নিজেদের ধর্মের নিয়ম কানুন সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার অর্থ এর থেকে বেশী কিছুই হতে পারে না। শুধু তাই নয়, এর থেকে বেশী অর্থ খুঁজতে গেলে এবং খুঁজে পেতে যাওয়া সেই অর্থের ভিত্তিতে জোর-জুলুম করলেই আসলে ধর্মের অবমাননা করা হয়, যে কোন মতেরই অবমাননা করা হয়। এবং সেটা করলে সে অবমাননা অথবা পবিত্রতা বিনষ্ট সেই নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী নামে পরিচিত ব্যক্তিরা অথবা সংগঠন করে থাকে।

জামাতে ইসলামীর সদস্যদের মধ্যে যতজন প্রকৃতপক্ষে ইসলামের পাবন্দ তার হিসেব বের করা সহজ কাজ নয়। তবে এঁরা যে ধর্মের নামে সকলেই ধনিক শ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থে ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে থাকেন তাতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়টি "রমজানের পবিত্রতা" রক্ষার নামে হোটেল-রোস্তোরাঁ বন্ধ রাখার ব্যাপারে তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি-মিছিল ইত্যাদির বক্তব্য এবং শ্লোগানের মধ্যেও বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

জামাতে ইসলামী হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধের ব্যাপারে বর্তমান নির্বাচিত "গণতান্ত্রিক" সরকারের সঙ্গে একমত ও এক নীতিরই অনুসারী। এর দ্বারা তাঁরা বোঝেন শুধু দরিদ্র জনগণের জন্য অথবা খুব জোর নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখা। ধনিক শ্রেণীর হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধের ব্যাপারে এঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে, মিছিলের শ্লোগান অথবা দেওয়াল লিখন থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ "ইসলাম ধর্মের ইজ্জত রক্ষা" অথবা "রমজানের পবিত্রতা" রক্ষার জন্য এগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন যে একই ধরনের সেটা বোঝার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এ দিক থেকে অন্যদের অসুবিধা না থাকলেও জামাতে ইসলামের লোকেরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করেন এবং রক্ষা করেন এক বিস্ময়কর নীরবতা। এই নীরবতা রক্ষা যে "রমজানের পবিত্রতা" রক্ষার সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেটা বড়ো মাপের বোকার পক্ষেও বোঝা কঠিন নয়।

এ বিষয়টির দিকে বিশেষভাবে তাকানো দরকার এ কারণে যে সোনারগাঁও, শেরাটন, পূর্বাণী ইত্যাদির মতো বড়ো বড়ো হোটেল এবং শেরাটন হোটেলের নিকটবর্তী 'সাকুরা' এবং গ্রীন রোডে অবস্থিত 'শ্যালে' ইত্যাদি রেস্তোরাঁতে শুধু খাদ্যই নয়, দিনের বেলা খাদ্যের সঙ্গে মদ্যও পরিবেশন করা হয়। বড়ো হোটেলগুলিতে এই সঙ্গে নৃত্যগীতও পরিবেশিত হয়, সে নৃত্যগীতের সঙ্গে ইসলামী পবিত্রতা অথবা মাহে রমজানের পবিত্রতার কোন সম্পর্ক নেই।

জামাতে ইসলামী আল্লাহর আইন চালু করা, ইসলামী হুকুমাত প্রবর্তন করা ইত্যাদির কথা বক্তৃতা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে বলার সময় দরিদ্র জনগণের জন্য এক বেহেশতী ব্যবস্থার কথা বলে থাকে। এ কথা যে তাদের দিক থেকে একটা ধোঁকাবাজী তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। এটা তাদের বক্তব্য এবং আসল তৎপরতার ফাঁক থেকেই বোঝা যায়।

কিন্তু যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে জামাতে ইসলামী দরিদ্র জনগণের, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে "ইসলামী উম্মাহর" কথা বলে থাকে সেজন্য তাদের কাছে আমাদের আহ্বান ঃ আপনারা যদি শ্রমজীবী মানুষ, অসুস্থ লোক, বাইরে থেকে আসা লোকজন, শিশু এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের দিকে কোন খেয়াল না রেখে "রমজানের পবিত্রতা" রক্ষার জন্য হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার পক্ষপাতী হন এবং সেটা না রাখলে মানুষের ওপর জোর-জবরদস্তি ও নির্যাতন করেন তাহলে নিজেদের তৎপরতা আপনারা শুধু দরিদ্র জনগণের হোটেল-রেস্তোরাঁর প্রতি সীমাবদ্ধ না করে নিজেদের দৃষ্টি ধনী ব্যক্তিদের জন্য সোনারগাঁও, শেরাটন, পূর্বাণীর মতো হোটেল এবং সাকুরা ও শ্যালের মতো রেস্তোরাঁর প্রতিও নিবদ্ধ করুন এবং সেই সব হোটেল রেস্তোরাঁ দিনের বেলা খোলা রাখলে সেগুলি ঘেরাও করুন, তাদেরকে বাধ্য করুন খাওয়া দাওয়া ও মদ্যপান বন্ধ করতে।

এই কাজ করতে যদি আপনারা আগ্রহী না হন ও ব্যর্থ হন এবং দরিদ্র জনগণের হোটেল রেস্তোরাঁগুলির ওপরেই "ইসলামী প্রেরণার" বশবর্তী হয়ে আক্রমণ পরিচালনা করেন তাহলে ইসলামী ধর্মমত অনুযায়ী আপনারা নিজেরাই ইসলামের অবমাননা করবেন এবং "রমজান মাসের পবিত্রতা" বিনষ্ট করে সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় পুঁজির ধারক-বাহক বাঙালী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর এটাই নিশ্চতভাবে ধরে নেওয়া যাবে। এদিক দিয়ে আপনারা এখন এক পরীক্ষার সম্মুখীন। এই পরীক্ষা জনগণের সামনে আপনাদেরকে দিতে হবে। সেটা না দিলে আপনারা ইসলাম ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার যথেচ্ছভাবে করে নিজেদের কুৎসিত শ্রেণীচরিত্র বাঙলাদেশের শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে উদঘাটন করবেন।

৮.৩.১৯৯২

দৈনিক ভোরের কাগজ
১২ মার্চ ১৯৯২

হতাশার গর্ভে সৃষ্ট ধর্মীয় মৌলবাদ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন

ধর্মীয় মৌলবাদ এখন সারা বিশ্বের কিছু দেশে মাথাচাড়া দিয়েছে। এই মাথাচাড়া লক্ষ্য করে বাঙলাদেশের ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামী একে ধর্মের বিশেষত ইসলাম ধর্মের, জয়-জয়কার বলে প্রচার করছে। আপাতঃদৃষ্টিতে জামাতের এই প্রচার যতোই সঠিক হোক, আসলে ধর্মীয় মৌলবাদের এই উত্থানকে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অথবা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদির প্রমাণ মনে করার কোন কারণ নেই।

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইসলামী মৌলবাদসহ বিভিন্ন রকম ধর্মীয় মৌলবাদের উদ্ভব ঘটছে এক একটি দেশের জনগণের জীবনে ব্যাপক ও গভীর হতাশার মধ্যে। এই হতাশা একদিকে যেমন দেখা যাচ্ছে পুরোদস্তুর পুঁজিবাদী পশ্চাৎপদ কিছু দেশে, তেমনি সেটা আবার কিছুটা দেখা যাচ্ছে সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রগুলোর কোন কোনটির মধ্যে। এ জন্যে বলা চলে যে, ধর্মীয় মৌলবাদী যে কোন রাজনৈতিক পার্টিই হলো হতাশার পার্টি।

আমাদের দেশের দিকে তাকালেও আমরা সেটাই দেখতে পাই। এই ধরনের পার্টির মূল ভিত্তি হচ্ছে পশ্চাৎপদ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে। তাছাড়া সমাজের যে অংশের ভেতর এই মৌলবাদের বিস্তার ঘটে তাদের কোন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না। এদের মধ্যে অনেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করলেও তাদের চিন্তাধারা পশ্চাৎপদই থাকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন বিকাশ তাদের মধ্যে ঘটে না। তারা এক ধরনের গুহাবাসী।

এ কারণে ধর্মীয় মৌলবাদ নামে ঐতিহাসিকভাবে বিলুপ্ত চিন্তাধারা তাদের মধ্যেই বিস্তার লাভ করে যারা চিন্তা ক্ষেত্রে অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তায় অনভ্যস্ত, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষা থাকা সম্ভব এবং বাস্তবতঃ থাকেও। এই শিক্ষিত অংশরাই মূলতঃ নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে মৌলবাদী পশ্চাৎপদ চিন্তাকে ব্যবহার করে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করে।

কিন্তু পশ্চাৎপদতার মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদের "আদর্শিক" বিস্তারের নিহিত সম্ভাবনা থাকলেই যে মৌলবাদ কোন সমাজে বিকাশ লাভ করবে সেটা নয়। এ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন বিশেষ ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি—হতাশার পরিস্থিতি। হতাশার

সঙ্গে এ কারণেই মৌলবাদের সম্পর্ক শুধু যে গভীর ও নিবিড় তাই নয়, একেবারে অবিচ্ছিন্ন। এমন কোন সমাজই বর্তমান বিশ্বে নেই যেখানে হতাশার সামাজিক ও মানসিক ভিত্তিভূমি ছাড়া মৌলবাদের কোন ধরনের বিকাশ ঘটছে।

ইরানে শাহের চরম শোষণ-নির্যাতন এবং সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে মস্কো নিয়ন্ত্রিত সেখানকার তুদেহ (কমিউনিস্ট পার্টি) পার্টির বিপ্লব বিরোধী লাইনের ব্যর্থতা জনগণের মধ্যে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিলো সেই হতাশার গর্ভেই বিকাশ লাভ করেছিলো খোমেনীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী মৌলবাদ। মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কয়েকটি দেশে ধর্মীয় মৌলবাদ ঠিক সেই পরিমাণে শক্তিশালী হয়েছে যে পরিমাণে সেখানে হতাশার বিস্তার ঘটেছে। সম্প্রতি আলজিরিয়ায় মৌলবাদীদের শক্তি বৃদ্ধির ভিত্তিও হচ্ছে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশাভঙ্গ ও হতাশা। এ কারণেই দেখা যায় যে, কোন দেশে ধর্মীয় মৌলবাদের বিকাশ ও বিস্তার বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশ ও বিস্তারের মতো ঘটে না।

বিপ্লবী সংগ্রাম বিকশিত হওয়ার সময়ে জনগণের ওপর চরম শোষণ-নির্যাতন থাকে। কিন্তু সেই শোষণ-নির্যাতনের সঙ্গে থাকে সমাজকে, সমাজের মৌলিক আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে পরিবর্তন করার মতো চেতনার বিকাশ এবং সে বিকাশকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে ধারণ করা ও এগিয়ে নেয়ার রাজনৈতিক পার্টি। এই চেতনা এবং এই পার্টির অস্তিত্ব যেখানেই আছে সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদের বিকাশের কোন বাস্তব সম্ভাবনা নেই। বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোন উদাহরণ নেই যেখানে এই বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে পরাজিত করে ধর্মীয় মৌলবাদ বিকশিত ও বিস্তৃত হতে সক্ষম হয়েছে। উপরন্তু সেই পরিস্থিতিতে ধর্মীয় মৌলবাদের নামে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণ সচেতন থেকেছেন এবং ধর্মীয় চিন্তাধারা বিদ্যমান থাকলেও ঐতিহাসিক মূল স্রোতধারার মধ্যে তার বিন্দুমাত্র কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকেনি। একথা একটি দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের বিকাশের সময় যেমন প্রযোজ্য তেমনি সেটা প্রযোজ্য সেই সমস্ত দেশে যেখানে সমাজতন্ত্র একটি বৈপ্লবিক ব্যবস্থা হিসেবে বাস্তবতঃ বিদ্যমান।

পশ্চাৎপদ দেশে যেমন সত্যিকার বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির সুযোগে ধর্মীয় মৌলবাদের বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তেমনি সেই সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণে কোন দেশে ভেঙে পড়ে সেখানে পূর্ববর্তী আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার সকল গণবিরোধী চরিত্র নিয়ে, সাময়িকভাবে হলেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে। ঠিক এ রকমটিই ঘটছে সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন কোন দেশে। সেগুলোতে ইরান বা আলজিরিয়ার মতো মৌলবাদী শক্তি এতো জোরালো এবং ব্যাপক না হলেও তার বিকাশের কিছুটা সম্ভাবনা সেখানে ইতিমধ্যেই লক্ষণীয়। এই সম্ভাবনা লক্ষ্য করেই ইরানের মতো ধর্মীয় মৌলবাদী রাষ্ট্র সেখানে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। পোল্যান্ডেও ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্বে খৃষ্টান ধর্মীয় মৌলবাদও একই কারণে জয়লাভ করেছিলো। কিন্তু হতাশার এক নোতুন পরিস্থিতিতে, পুঁজিবাদের ব্যর্থতার মুখে, ধর্মীয়

মৌলবাদ সেখানে দ্রুত পিছু হটছে। আমাদের দেশও এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম নয়। ১৯৬০-এর দশকে কৃষকশ্রমিক ইত্যাদি শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিক্রিয়ায় মধ্যশ্রেণীর একটি অংশের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেছিলো। পাকিস্তান ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা রোধ করার জন্যে তারা ধর্মের জিগির তুলেছিলো। সেই স্পষ্ট শ্রেণীগত উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হওয়া মুসলিম লীগের মতো একটি মৃত সাম্প্রদায়িক দলের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সেটা কিছুটা সম্ভব ছিলো জামাতে ইসলামীর মতো একটি ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের পক্ষে, যার শ্রেণী চরিত্র খুব স্পষ্ট এবং এ কাজ করার জন্যে আদর্শগত (যত নিম্ন পর্যায়েরই হোক) প্রস্তুতি যাদের আছে।

কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে তারা সোচ্চার এবং সংগঠিত হতে থাকলেও জনগণের বিপুল বিশাল অধিকাংশ ছিলো তাদের আয়ত্তের বাইরে। পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও তারা তখন উদ্বুদ্ধ, সংগঠিত এবং আন্দোলিত হচ্ছিলো শ্রেণী সংগ্রামে ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এ জন্যে ১৯৭১ সালে জনগণের উপর সামরিক সরকারের সর্বাত্মক আক্রমণে জামাতে ইসলামী ইসলামের নাম করে পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে হাত মেলালেও জনগণ তাদেরকে ঘৃণার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সেই প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তারা তৎকালীন পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, বাড়ী-ঘরে আগুন দেয়াসহ সবধরনের নির্যাতনই জনগণের উপর করেছিলো। জনগণের মধ্যে তাদের এই "ভাবমূর্তিই" তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। সেই আশা উদ্দীপনা এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে হতাশার কোন স্থান ছিলো না এবং সে জন্যে তাতে স্থান ছিলো না ধর্মীয় মৌলবাদের এবং জামাতে ইসলামীর। সর্বস্তরের জনগণ তখন জামাতে ইসলামীকে তাদের চরম শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন এবং জনগণের ভয়ে তারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলো, দেশ ছেড়ে বাইরে গিয়ে দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলো।

বাঙলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী মৌলবাদের ধারক-বাহক হিসেবে জামাতে ইসলামী কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছে। এখানেও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই শক্তি তারা সঞ্চয় করতে পেরেছে এমন এক পরিস্থিতিতে যার মূল দিকটি হচ্ছে হতাশা। বাঙলাদেশ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমজীবী জনগণ যে জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে জীবন তাঁরা পাননি। কমিউনিস্ট বা বামপন্থী নেতৃত্বের থেকে তাঁরা যে বিকল্প সংগ্রাম প্রত্যাশা করেছিলেন সে সংগ্রাম নানা কারণে এখনো অসংগঠিত এবং দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে জনগণের উপর চলছে বিভিন্ন প্রকার সামরিক এবং বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রের চরম শোষণ-নির্যাতন। এর হাত থেকে উদ্ধার লাভের কোন আশা না দেখে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক রকম হতাশার পরিস্থিতি। এই হতাশার পরিস্থিতিকে সম্বল ও পুঁজি করেই জামাতে ইসলামী দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সহায়তায় শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। এভাবে তারা ধর্মকে ব্যবহার করছে দেশীয় শোষক-শাসক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের

শ্রেণীস্বার্থরক্ষার গণবিরোধী উদ্দেশ্যে। জামাতে ইসলামীর যাঁরা বিরোধিতা রাজনৈতিকভাবে করতে চান তাঁদেরকে এ বিষয়গুলো ভালোভাবে ভেবে দেখতে হবে। শুধু আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়েই এ কাজ করলে হবে না।

জামাতের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম হলো শ্রেণী সংগ্রাম, সাধারণভাবে শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মূলতঃ এভাবে সংগ্রাম ব্যতীত জামাতে ইসলামীকে অন্যভাবে প্রতিরোধ করতে যাওয়ার অর্থই হলো এই সংগ্রামকে বিপথে চালনা করা এবং তার পরিণতিতে শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করা।

১৩.৩.১৯৯২

দৈনিক আজকের কাগজ
১৮ মার্চ ১৯৯২

২৬শে মার্চের গণআদালত অসমাপ্ত মুক্তি সংগ্রামের জের

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ আমাদের দেশের জনগণের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণের পর এ অঞ্চলে শুরু হয় জনগণের এক সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জনগণ এমনভাবে নির্ধারিত করেছিলেন যাতে তা সাধারণভাবে প্রচারিত ও পরিচিত হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে। জনগণ আশা করেছিলেন যে, সেই যুদ্ধের পরিণতিতে শুধু যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হবে তাই নয়। সেই স্বাধীন রাষ্ট্রে জনগণের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মিটবে এবং তাঁরা শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্ত হবেন।

১৯৭১ সালে নয় মাস সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠা হলেও তার পরিণতিতে জনগণের উপরোক্ত কোন আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। উপরন্তু তাঁদের উপর শোষণ-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়েছে। প্রগতিশীল শক্তিসমূহ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হয়ে তাবৎ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই সরকারে ও সরকারের বাইরে অবস্থান করে শ্রেণীগতভাবে জনগণের উপর তাদের শোষণ-নির্যাতন জারী রেখেছে।

১৯৭২ সাল থেকেই যে বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো সেটি হলো, জনগণকে বঞ্চিত করে বাঙালী মুসলমানদের একটি ছোট অংশ যতই ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছে ততই জনগণের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন শক্তির উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন বেড়েছে। অন্যদিকে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে জনগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে, ধর্মের নাম করে ধর্মবিরোধী কাজ করেছে, হীনতম উদ্দেশ্যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে তারা প্রত্যেকটি সরকারের আমলে ক্ষমা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এমন পর্যায়ে আজ এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সরকারী ক্ষমতায় থেকে অথবা সরকারের বাইরে থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তারা দখল করেছে। প্রগতিশীলতা ও গণতন্ত্রের পরিবর্তে তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা, অগণতান্ত্রিকতা, শ্রমিক-কৃষক পেশাজীবী জনগণের স্বার্থবিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের পদলেহন ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাঙলাদেশকে একটি ভিক্ষুকের দেশ হিসেবে পরিচিত করেছে।

সম্প্রতি জামাতে ইসলামীর নেতা গোলাম আজমকে তাদের দলের আমীর নির্বাচিত করার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সারা দেশের গণতান্ত্রিক মহলে যে, আলোড়ন ও

আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না। একদিকে জামাতের এই তথাকথিত রাজনৈতিক উত্থান যেমন এ দেশে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উত্থানের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত, তেমনি জামাতের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন ও সংগ্রামও জনগণের সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, তাঁদের রুটি-রুজির সংগ্রাম, তাঁদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের থেকে অবিচ্ছিন্ন, যদিও এই অবিচ্ছিন্নতার চেতনা ব্যাপক জনগণের মধ্যে এখন উচিতমতোভাবে স্পষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতা যে এই প্রতিরোধ সংগ্রামের বিকাশের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর হবে এবং জনগণ যে জামাতের মতো একটি ধর্মব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীল দলের বিরোধিতাকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে সক্ষম হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

আজ অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, বিশ বছর পর কেন আবার জামাতে ইসলামী এবং ১৯৭১ সালে তাদের স্বাধীনতাবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার বিষয়টি নোতুনভাবে তোলা হচ্ছে। তাদের মতে আওয়ামী লীগের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে, তাদেরকে দেশ গড়ার কাজে আহ্বান জানাবার মাধ্যমে, খোন্দকার মোশতাক কর্তৃক দালাল আইন রদ করার মাধ্যমে, জিয়াউর রহমান কর্তৃক তাঁদেরকে প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে এবং এরশাদ কর্তৃক ইসলামকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে জামাতে ইসলামের সকল পাপ ও দুষ্কৃতির ক্ষয় হয়েছে এবং এখন এতদিন পর এই প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। জামাত সমর্থক লোকজন এবং জামাতে ইসলামী নিজেও জামাতবিরোধী জনগণের এই রাজনৈতিক তৎপরতাকে ভারতীয় এজেন্ট ইত্যাদির তৎপরতা হিসেবে চিহ্নিত করে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রথমেই ধরা যাক, বিশ বছর সময় পার হওয়ার বিষয়টি। কারণ জামাতী প্রচারণার এটা বড়ো দিক। এখানে কি আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি যে, কোন ব্যক্তি যদি একজনকে হত্যা করে বিশ বছর আত্মগোপন করে থাকে, অথবা দেশের বাইরে থাকে অথবা তার বিচার না হয়, তাহলে তাকে বিশ বছর পর ধরে তার বিচারের ব্যবস্থা করলে সেটা কি দেশীয় আইন অনুযায়ী অবৈধ হয়? বিশ বছর অতিবাহিত হলেও পূর্বে তার বিচার হয়নি এই অজুহাতে কি তারা বিচারের দাবী দেশীয় আইনবিরোধী হয়? দেশীয় আদালত কি তার বিচার দেশীয় আইন অনুযায়ী করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। শুধু তাই নয়, যেখানে প্রচলিত আদালত ও সরকার এই ধরনের বিষয়কে অগ্রাহ্য করে চলে, সেখানেই ওঠে গণআদালতের প্রশ্ন। সর্বদেশে এবং সর্বক্ষেত্রে এটাই হয়ে এসেছে। এখনও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

কাজেই মাত্র একজনের হত্যার ক্ষেত্রে যা সত্য, লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে সেটা সত্য এবং প্রযোজ্য না হওয়ার কোনই কারণ নেই। উপরন্তু এই ধরনের বিচারের ব্যাপারে সময়ের ব্যবধান কোন বিচার্য বিষয়ই হতে পারে না।

এখন বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, সত্যিই বিশ বছর পর এই ব্যাপারটি নোতুনভাবে কেন সামনে এলো? কেন জনগণের ব্যাপক অংশ আজ জামাত বিরোধিতা এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে এতো সোচ্চার হলেন এবং গোলাম আজমের বিচারসহ জামাতের অতীত কার্যকলাপের বিচারের জন্য ব্যাপকতম পর্যায়ে দাবী কেন দ্রুতগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে? এর জবাব কোন বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা অথবা "ভারতীয় দালাল," "ইসলামের শত্রু," "আইন আদালতের শত্রু" ইত্যাদির চক্রান্তের মধ্যে সন্ধান করতে হবে না। এর সন্ধান করতে হবে এ দেশের জনগণের জীবনের মধ্যে, বিশ বছরব্যাপী তাঁদের জীবনের উপর শোষণ-নির্যাতন ও বঞ্চনার মধ্যে।

এ ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার আবার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জনগণের উপর এই শোষণ-নির্যাতন ক্রমান্বয়ে যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁদের জীবনে বঞ্চনা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই এদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, ততই বৃদ্ধি পেয়েছে ধর্মব্যবসার, ততই ঘটেছে জামাতে ইসলামীর মতো ধর্মব্যবসায়ী, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারী রাজনৈতিক দলের বিকাশ ও শক্তি বৃদ্ধি এবং ক্ষমতাসীন মহলে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। এই প্রভাব ও প্রতিপত্তি কি পর্যায়ে এখন দাঁড়িয়েছে সেটা গোলাম আজম এবং অন্য জামাত নেতাদের গণআদালতে বিচারের ব্যাপারটি নিয়ে বিএনপি সরকার ও জামাতে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ করার সময় শ্রমজীবী জনগণ যা কিছু চেয়েছিলেন তার কোন কিছুই আজ পর্যন্ত না পেয়ে, উপরন্তু তাঁদের অবস্থা অবনতির চরম প্রান্তে উপনীত হওয়ার ফলে তাঁরা চারদিকে ধর্মঘট, ঘেরাও, অবরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলনকে বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী করার জন্য একদিকে হচ্ছে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার। জামাত ও তাদের মতো ধর্মব্যবসায়ীরা মসজিদকে এবাদতের স্থান থেকে পরিণত করেছে তাদের অপবিত্র রাজনীতি প্রচার এলাকায়। তারা মসজিদকে পরিণত করেছে তাদের অফিসে। মাত্র গত শুক্রবার বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব নামাজের পর জামাতের স্বপক্ষে মসজিদের সামনে জনসভা করে যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, তাতে তিনি এদেশের প্রগতিশীল জনগণের ও তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করেছেন সে বিষোদ্গারের অধিকার তাঁকে কে দিয়েছে? এই কাজ করবার জন্যই কি বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব হিসেবে ধর্মপ্রাণ জনগণসহ সাধারণ জনগণের অপরাপর অংশের লোকদের অর্থে তাঁকে প্রতিপালন করা হচ্ছে? মসজিদের খতিবের এই রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের পিছনে শক্তির যোগান দিচ্ছে কারা? এই শক্তির যোগান যে একদিকে জামাতের মতো প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মব্যবসায়ী এবং অন্যদিকে সরকারী মহল থেকেই আসছে তাতে সন্দেহ নাই। সরকারের ইশারা, এমনকি গোপন নির্দেশ ছাড়া এ কাজ যে বায়তুল মোকাররমের খতিবের পক্ষে সম্ভব ছিলো না এটা ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন আছে কি?

কাজেই বর্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে "আইন-শৃংখলা ভঙ্গের" অজুহাত দিয়ে সরকার যেভাবে জামাতে ইসলামীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাতে দু'টি বিষয় খুব পরিষ্কার। প্রথমতঃ, সরকার বিগত নির্বাচনের মাধ্যমে 'বিরাট বিজয়' অর্জন করে "গণতান্ত্রিক" সরকার গঠন করা সত্ত্বেও নিজেদের গণবিরোধী নীতি পুরোপুরি কার্যকর করে যাওয়ার মাধ্যমে জনগণ থেকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। যতোই তারা এইভাবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ততোই তাদের প্রয়োজন হচ্ছে ধর্মকে রাজনীতির কাজে ব্যবহার করা। পরলোকের কথা বলে, বেহেশত-দোজখের কথা তুলে জনগণের মধ্যে লোভ ও ভয়ের সঞ্চার করা এবং বর্তমান সময়ের সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে কাফন পরার পরবর্তী অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য জনগণকে "উদ্বুদ্ধ" করা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সঙ্গে, দেশীয় সরকার এবং সাম্রাজ্যবাদের ও মধ্যপ্রাচ্যের চরম প্রতিক্রিয়াশীল কয়েকটি রাষ্ট্রের সহযোগিতার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করে শোষক-শাসকদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে, তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী একটি দল হিসেবে জামাতের অবস্থান দৃঢ় হতে থাকা। এদিক দিয়ে বিচার করলে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি ও জামাত উভয়েই জনগণের শত্রুস্থানীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের সামনে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের চরিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করছে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ও যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এখনো পর্যন্ত জনগণের দিক থেকে অপূর্ণই রয়ে গেছে। এই অপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জনগণ এখন কল-কারখানা, ক্ষেত খামার, অফিস আদালত, স্কুল-কলেজ সর্বত্র সংগ্রাম করছেন। এইভাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের জের নোতুনরূপে এবং নোতুন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করছে। এই আত্মপ্রকাশের যে প্রতিক্রিয়া একভাবে আমরা ১৯৭১ সালে দেখেছিলাম, সেই প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানী শোষক-শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ যেভাবে জামাতে ইসলামীর মতো ধর্ম ব্যবসায়ী গণবিরোধী শক্তিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছিলো মূলতঃ সেই একই ধরনের ব্যবহার এখনো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নোতুন রাজনৈতিক দল, তাদের নির্বাচিত "গণতান্ত্রিক" সরকার করছে।

এদিক দিয়ে বলা চলে যে ১৯৭১ সালের পাকিস্তান সরকারের উত্তরাধিকারীই হলো বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার, তৎকাল যে শ্রেণীসমূহ জনগণের শোষক-নির্যাতক ছিলো তারাই ক্ষমতায় থেকে ও ক্ষমতার বাইরে থেকে উভয়ভাবেই এখনো জনগণের শোষক-নির্যাতক। এই একই শ্রেণীর শোষক-নির্যাতকরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে যেভাবে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার পাকিস্তানী আমলে করতো, তার থেকেও কুৎসিত এবং নগ্নভাবে বর্তমান শোষক-শাসক শ্রেণীর ও তাদের সরকার নিজেরা জামাতে ইসলামের সহযোগিতায় করছে এবং আরও ব্যাপক আকারে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ সবই হলো জনগণের অসমাপ্ত মুক্তি সংগ্রামের জের। কাজেই ২৬শে মার্চের গণআদালতে জামাত নেতাদের বিচারের পুরো ব্যাপারটি নিয়ে যতো বিরুদ্ধ প্রচারণাই করা হোক, তাকে বাধা দেওয়ার যতো চেষ্টাই হোক, ২৬শে মার্চের পরও মুক্তি সংগ্রামের জের অব্যাহত থাকবে। তাকে ব্যাহত করার মতো শক্তি কারো নেই। কারণ জনগণের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও তার গতি প্রকৃতপক্ষে অপ্রতিরোধ্য।

২১.৩.১৯৯২

দৈনিক ভোরের কাগজ
২৩ মার্চ ১৯৯২

একুশ বছর পর

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে আমাদের দেশের জনগণের ওপর পাকিস্তান সরকার ও তাদের সেনাবাহিনীর ব্যাপক সশস্ত্র আক্রমণ শুরু হওয়ার পর ২৬শে মার্চ থেকেই জনগণ সেই শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে থাকেন এক সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম যা দ্রুতগতিতে পরিণত হয় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে। সেই যুদ্ধের পরিণতিতে এই অঞ্চলে অবাঙালী মুসলিম শোষকদের শাসন উচ্ছেদ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালী মুসলমান শোষকদের শাসন।

নোতুন শাসকরা শাসিতদের মতো ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও শ্রমজীবী দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি "করুণার" বশবর্তী অথবা "দয়াপরবশ" হয়ে তারা নিজেদের শোষণ নির্যাতনের মাত্রা বিন্দুমাত্র হ্রাস করেনি। উপরন্তু ১৯৭২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তাদের শোষণ নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং যেসব কারণে কৌশল অবলম্বন করে পাকিস্তানী মুসলমানরা বাঙালীদের ওপর শোষণ নির্যাতন জারী রাখতো সেই একই কায়দা কৌশল অবলম্বন করে বাঙালী মুসলমান শোষক শাসকরা শ্রমজীবী দরিদ্র মুসলমান জনগণের ওপর, এবং সেই সঙ্গে অন্য ধর্মীয় জনগণের ওপর নিজেদের শোষণ নির্যাতন শুধু জারী রেখেছে তাই নয়, তার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করেই চলেছে।

কারখানা শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, সাধারণ কৃষক, গ্রামীণ ও শহুরে পেশাজীবী প্রত্যেকের জীবনের দিকে তাকালেই এ বিষয়টি খুব পরিষ্কার হবে। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান পাকিস্তানী আমলে এবং বর্তমান আমলে কি রকম সেটা বোঝার জন্যে প্রত্যেক স্তরের ও অংশের জনগণ নিজেদের আয় ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির একটা তুলনা করলেই তা যথেষ্ট।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ঠিক আগে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ছিলো মাসিক ১২৫ টাকা এবং অন্যান্য খাতে তাদের প্রাপ্য নির্ধারিত হয়েছিলো মাসিক ৩০ টাকা। অর্থাৎ তাদের মজুরী সে সময় ছিলো মোট ১৫৫ টাকা। যে সময় নিম্নতম মজুরীর হার এ পর্যায়ে ছিলো তখন চালের দর ছিলো সের প্রতি দশ কি বারো আনা। তার বেশী নয়। বর্তমানে সেই একই শ্রমিকদের মাসিক মজুরী হচ্ছে ৫৬০ টাকা। কিন্তু এখন সব থেকে সস্তা চালের মূল্য কিলো প্রতি ১৩/১৪ টাকা। কাজেই মজুরী যেখানে নগদ টাকায় বেড়েছে চার গুণের কম সেখানে চালের মূল্য বেড়েছে প্রায় বিশ গুণ অথবা তার থেকেও বেশী। অর্থাৎ প্রকৃত আয় পাকিস্তানী আমলের শেষ দিকে যা ছিলো, বর্তমান বাঙলাদেশে এসে দাঁড়িয়েছে তার পাঁচ গুণ কম।

শ্রমিকদের মজুরীর বিষয়টিকে বেছে নিয়ে পাকিস্তানী আমল এবং বর্তমান আমলে শ্রমজীবী জনগণের আয়-ব্যয়ের তুলনা করা হলো এ কারণে যে, এখানে নিম্নতম মজুরীর ও মূল্য বৃদ্ধির একটি হিসেবে সহজেই মিলিয়ে দেখা যায়। এইভাবে মিলিয়ে দেখা হিসেবটি সাধারণ শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক, ক্ষেতমজুর, শিক্ষক, চিকিৎসক ইত্যাদি ধরনের শ্রমজীবী পেশাজীবী জনগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এবং এভাবে এটা প্রযোজ্য হওয়ার জন্যই আজ শুধু যে শ্রমিকরাই আন্দোলনে নামছেন নিজেদের মজুরী বৃদ্ধি, কাজের বিভিন্ন শর্ত পরিবর্তন, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদির জন্যে তাই নয়। অন্য মহলও প্রায় একইভাবে একই উদ্দেশ্যে আন্দোলনে নামছেন। এই পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৭১ সালের পরিস্থিতির আর একটি মিল ও সাদৃশ্য হচ্ছে সে সময় জনগণের দাবী-দাওয়া রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংগ্রাম বিভ্রান্ত, বিভক্ত ও বিপথগামী করার জন্য যেভাবে সরকার ও ধর্মব্যবসায়ী এবং ধর্মের সরাসরি রাজনীতি ব্যবহারকারী দল জামাতে ইসলামী হাতে হাত বেঁধে জনগণের সংগ্রামের বিরোধিতা করতো ঠিক একইভাবে আজ বাঙলাদেশের “গণতান্ত্রিক” সরকারও জামাতে ইসলামীর হাতে হাত বেঁধে জনগণের গণতান্ত্রিক দাবীর বিরোধিতা করতে মাঠে নেমেছে। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে ইহজগতের সমস্যার সমাধানের জন্যে সংগ্রাম স্থগিত রেখে বা তাকে বাতিল করে “পরলোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের” জন্যে এক কর্মসূচী তারা হাজির করছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমগুলিতে বিশেষতঃ রেডিও এবং টেলিভিশনে ধর্মীয় প্রচারের নামে ধর্মের বিকৃত প্রচারণা কর্তৃক ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের এবং জামাতে ইসলামীর রাজনীতির পক্ষে সরকারের গাঁটছড়া বাঁধার একটা বড়ো উদাহরণ।

পরিস্থিতির এই দিকটির দিকে তাকালে বোঝা যাবে যে, অবাঙালী মুসলমানের পরিবর্তে বাঙালী মুসলমানের শাসন এই অঞ্চলে কায়েম হলেও জনগণের শ্রেণী শত্রুদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র তাদের জাতীয় চরিত্রের। অবাঙালীর পরিবর্তে বাঙালী শোষক শাসকদের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে। এদিক দিয়ে বিচার করলে এখনকার বর্তমান সরকার হলো পাকিস্তানী সরকারেরই উত্তরাধিকারী বা উত্তরসুরি। এই উত্তরাধিকার সূত্রে আবদ্ধ থাকায় অবাঙালী পাকিস্তানী শোষক শাসকদের শোষণ শাসনের ঐতিহ্য, বর্তমান বাঙালী শোষক শাসকরা একইভাবে বহাল রেখেছে। সেই ট্রাডিশনই সমানে চলছে। তার মধ্যে গুণগত কোন পরিবর্তন একুশ বছরে ঘটেনি।

জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধ করে এখানে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে এদেশের প্রত্যেক ক্ষমতাসীন সরকারই দাবী করে এসেছে। তারা দাবী করেছে এদেশ থেকে বিদেশী শোষক শাসকদের উচ্ছেদ করে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশীয় জনগণের শাসন ব্যবস্থা। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি প্রকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।

এ সবই যে মিথ্যা সেটা ১৯৭২ সাল থেকেই সত্য। ১৯৭২ সালে তৎকালীন বাঙলাদেশ ছিলো ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের হুকুমবরদার একটি রাষ্ট্র। পরবর্তী পর্যায়ে এখানে সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলেও ভারত একটি বৈদেশিক শক্তি হিসেবে এদেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি এমনকি রাজনীতি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাবশালী থেকেছে এবং এখনো রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত বলতে নিশ্চিতভাবে বোঝায় ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার, যে সরকার সেখানকার জনগণের ওপরও চালিয়ে যাচ্ছে নির্মম শোষণ এবং সেই শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্যে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতন, বর্ণ নির্যাতন।

বর্তমান স্বাধীনতার একুশ বছর পর বাঙলাদেশের শোষক শাসক ও লুণ্ঠনকারীরা জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়ে এনেছে শতকরা এক ভাগেরও কমে। দেশীয় সম্পদ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা তো দূরের কথা বাৎসরিক বাজেটও নিজেদের সম্পদের ওপর নির্ভর করে তৈরী করা এই সরকারের দ্বারা সম্ভব নয়। এর জন্যেও তারা সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষতঃ জাপান ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার কারণেই বাঙলাদেশের "জাতীয় স্বাধীনতা," "জাতীয় মর্যাদা" সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে "জাতীয় প্রতিরোধ" ইত্যাদি বলতে কিছুই নেই। উপরন্তু তার স্থানে আছে জাতীয় স্বার্থ বলতে যা কিছু বোঝায় সেটা সাম্রাজ্যবাদের কাছে বন্ধক রাখা।

এই বন্ধকী পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাঙলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক নৌ-ঘাঁটি করার সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আসলে এ চক্রান্তের অংশ হিসেবেই চক্রান্তমূলক নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ খালেদা জিয়াকে ওয়াশিংটনে তলব করেছেন। এ দিক দিয়ে দেখলে ১৯৭১ সাল থেকে আমাদের দেশের জনগণের অবস্থা কোন দিক দিয়েই ভালো নয়। অর্থাৎ জনগণের জীবনে অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি বিবেচনা করলে জনগণের জীবনে কোন উন্নতি এই একুশ বছরে মোটেই হয়নি। উপরন্তু এসব দিক দিয়ে অবস্থার অনেকখানি অবনতি হয়েছে।

শুধু একটি দিক থেকে সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে এটা বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের রূপরেখা প্রকৃত দেশী এবং আন্তর্জাতিক শত্রুদের জনগণের সামনে চিহ্নিত হতে থাকার বিষয়টি। এই প্রক্রিয়া বাহ্যতঃ এখন খুব মুখ্যভাবে আত্মপ্রকাশ না করলেও এবং এই চিহ্নিতকরণের ভিত্তিতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপযোগী সাংগঠনিক প্রস্তুতি এখনো নিম্নস্তরে থাকা সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়া বর্তমান পরিস্থিতির সব থেকে সম্ভাবনাময় এবং উল্লেখযোগ্য দিক।

বাঙালী মুসলমান শোষক শাসকরা বাঙালী মুসলমানসহ বাঙলাদেশের সকল শ্রমজীবী জনগণের উপর যে শোষণ শাসন বিগত একুশ বছর ধরে চালিয়ে আসছে তাকে প্রতিরোধ করে তার উচ্ছেদের জন্যে সংগ্রাম নোতুনভাবে শুরু হওয়ার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, পাকিস্তানী শোষক শাসকদের সহযোগী ধর্মব্যবসায়ী ও

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারী জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপক বিক্ষোভ। শ্রমজীবী জনগণের সাধারণ সংগ্রামের সঙ্গে বর্তমান সরকারের ও সহযোগী ধর্মব্যবসায়ী জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তাই প্রকৃত অর্থে ২৬ মার্চ গণআদালতের কর্মসূচী শ্রমজীবী জনগণের সাধারণ সংগ্রামের কর্মসূচীরও এক অবিচ্ছিন্ন অংশ।

২১.৩.৯২

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ
২৬ মার্চ ১৯৯২

জামাতে ইসলামী কর্তৃক জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চক্রান্ত

২৬শে মার্চ গণআদালতে জামাতে ইসলামী নেতা গোলাম আজমের বিচারকে কেন্দ্র করে সারাদেশে একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বেশ কিছুদিন থেকে নিশ্চিন্তে বিকাশমান জামাতে ইসলামীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে, তাদের এই নিশ্চিন্ত বিকাশ ও বৃদ্ধি নোতুনভাবে এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, গণআদালতের এই কর্মসূচীটি প্রথমে কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা নির্ধারিত হয়নি, হয়েছে কিছু সংখ্যক এমন ব্যক্তির দ্বারা যারা ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন অথবা সেই যুদ্ধে প্রিয়জনদেরকে হারিয়ে মর্মান্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু আপাতঃদৃষ্টিতে এই "অরাজনৈতিক" ব্যক্তিদের অর্থাৎ রাজনৈতিক কোন দলের সদস্য সরাসরিভাবে নন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা এই কর্মসূচীর শুরু হলে, প্রথম থেকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট এবং পরে পাঁচ দলসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোট তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে, বামপন্থী ছাত্রদের ঐক্যজোট 'গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য' সক্রিয়ভাবে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করে আসছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা দরকার যে, 'অরাজনৈতিক" ব্যক্তিদের দ্বারা এই কর্মসূচী শুরু হলেও এর চরিত্র সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। শুধু তাই নয়, সারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমানে একটি পর্যায়ে এসে দাঁড়ানোর কারণেই এই রাজনৈতিক কর্মসূচী "অরাজনৈতিক" ব্যক্তিদের উদ্যোগে নির্ধারিত হলেও সেটা এই মুহূর্তে পরিণত হয়েছে দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচীতে। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল দিকটি হলো, জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতনের অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি এবং তার কোন প্রতিকারের পথ দেখতে না পেয়ে তাঁদের মধ্যে একদিকে হতাশার বৃদ্ধি অন্যদিকে বৃদ্ধি বিক্ষোভ প্রতিবাদ এবং আন্দোলনমুখিতার।

এ ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে বিরাজমান হতাশা ও তাঁদের পশ্চাৎপদ চিন্তা-চেতনাকে আশ্রয় ও পুঁজি করেই জামাতে ইসলামী ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে বামপন্থী, কমিউনিস্ট, গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীল বলে যাদেরকে চিহ্নিত করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে নিজেদের প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই জনগণের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তারা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের খেদমত

করছে এবং নিজেদেরও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করছে। ভয়ানকভাবে ধিকৃত অবস্থা কাটিয়ে উঠে তারা নিজেদেরকে সামাজিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

অন্যদিকে শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের বিশাল অংশের মধ্যে আজ বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে, প্রতিবাদে তাঁরা মুখর ও সোচ্চার হচ্ছেন এবং মেহনতি জনগণ, বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী জনগণ এখন ধর্মঘট, ঘেরাও, অবরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন করছেন। তাঁরা আন্দোলনে নেমে ক্রমশঃ মারমুখীও হয়ে উঠছেন। জনগণের এই অংশের মধ্যেই এখন জামাতে ইসলামী নেতা গোলাম আজমের জন্য গণআন্দোলনের কর্মসূচীর সব ক্ষেত্রে ব্যাপক ও শক্তিশালী সমর্থন আসছে। এদিক দিয়ে মেহনতি জনগণের ধর্মঘট, ঘেরাও অবরোধ আন্দোলন অর্থাৎ সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন পদ্ধতির বাইরে বের হয়ে সংগ্রাম ও আন্দোলন এবং বিদ্যমান আদালতের বাইরে গোলাম আজমের বিচার ব্যবস্থা খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। উভয় ক্ষেত্রেই দেশের বিদ্যমান আইন কানুন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি অথবা সেই কাজ না করার কারণেই প্রচলিত পদ্ধতি বর্জন করে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, চিকিৎসক, হোটেল কর্মচারী, প্রভৃতিকে নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। মূলতঃ ঐ একই কারণে অর্থাৎ সাধারণ আদালত এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ বিচার ব্যবস্থা বা ট্রাইব্যুনাল না করার কারণেই ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধীদের বিচার গণআদালতে করতে হচ্ছে।

গণআদালতে বিচারের এই কর্মসূচী ও ব্যবস্থা জামাতে ইসলামীকে তাদের অর্থসম্পদসহ অন্যান্য শক্তি সত্ত্বেও যথেষ্ট ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। জনগণের ভয়ে তারা দিন দিন ভীত হয়ে উঠছে কারণ ইহলোকের সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের দ্বারা প্রচারিত "পরলোকের" কর্মসূচী জনগণের মনে আর কোন দাগ কাটছে না, জনগণ তাদের এই কর্মসূচীর আসল চরিত্র এখন আগের চেয়ে বেশী করে উপলব্ধি করতে পারছেন।

এই পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের প্রচার কাজ এখন এমনভাবে সংগঠিত করছে যাতে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়, তাঁরা নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে এবং গণআদালতে গোলাম আজমের বিচারের কর্মসূচীর মধ্যে কোন মিল ও সাদৃশ্য দেখতে না পান। উপরন্তু তাঁরা যেন গণআদালত গঠনকারী ও তার পক্ষে আন্দোলনকারীদেরকে 'অধার্মিক' জনগণ কর্তৃক ধর্মপালনবিরোধী, 'কমিউনিস্ট চক্রান্তকারী,' 'ভারতের দালাল' ইত্যাদি হিসেবে ধরে নিয়ে তাঁদের বিরোধিতা করতে দাঁড়ান। এসব দিক দিয়ে জামাতে ইসলাম ও পাকিস্তানীদের তৎকালীন প্রচারণার মধ্যে হুবহু মিল সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই মিল অকারণে নেই। সেটা আছে এজন্য যে, পাকিস্তানীরা সে সময় জনগণের শত্রু হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্সি হিসেবে যেভাবে সক্রিয় ছিলো সেভাবেই এখন বাঙালী শোষক-শাসক শ্রেণী জনগণের উপর শোষণ নির্যাতন করছে এবং জামাতে ইসলামী এ ব্যাপারে পাকিস্তানীদের সঙ্গে যেভাবে

সহযোগিতা করতো যেভাবে তৎকালীন শোষকদের সহযোগী হিসেবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করতো এখনো তারা সেটাই করছে।

জনগণকে বিভক্ত করার জন্য ১৯৭০-৭১ সালে তারা এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলো।

কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। এখনো তারা সারা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে 'ভারতের দালাল' হিসেবে প্রচার করছে এবং সেইভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে।

ভারতে বর্তমানে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ক্ষমতাসীন রয়েছে এবং সে সরকার তাদের নিজেদের জনগণের উপরও যথেষ্ট শোষণ-নির্যাতন করছে। তার বিরুদ্ধে ভারতের মেহনতি জনগণ কিছু অঞ্চল জুড়ে বিশেষভাবে এবং সমগ্র দেশব্যাপী সাধারণভাবে সংগ্রাম করছেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সরকারের দালালরা এদেশে যে নেই তা নয়। তারা থাকতে পারে এবং আছে। ঠিক যেমন আছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল, যার মধ্যে জামাতে ইসলামীই হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এই জামাতীরা সউদী আরবের রাজতন্ত্র ও বাদশাহেরও দালাল যারা সম্প্রতি কোরআনের একটি আয়াত ("রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে। ইহারাও এইরূপ করিবে।" কোরআনের পারা ১৯, সুরা ২৭, নমল আয়াত নম্বর ৩৪) সউদী আরবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (দ্রষ্টব্য দৈনিক ইনকিলাব ২০শে মার্চ ১৯৯২) কোরআনের অবমাননা করেছে। সউদী রাজতন্ত্রের দালাল ও তাদের থেকে নিয়মিত বিশাল অংকের অর্থপ্রাপ্ত জামাতে ইসলামী কোরআনের এই অবমাননার বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেনি। এ ব্যাপারে তাদের এই দালালসুলভ আচরণ একদিকে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এবং অন্যদিকে বিশেষভাবে ইসলামের "পাবন্দ" হিসেবে নিজেদের ভণ্ড চরিত্র জনগণের কাছে উদ্ভাবন করেছে। আন্দোলনরত শ্রমজীবী জনগণ অথবা গণআদালতে জামাত নেতা গোলাম আজমের বিচারের কর্মসূচী যাঁরা নিয়েছে ও কার্যকর করার জন্য আন্দোলন করছে তাঁরা কোন ধরনেরই ভারতীয় দালাল নয়, অথবা জামাতে ইসলামীর মতো মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদ ও সউদী রাজতন্ত্রের দালাল নয়। তাঁরা সংগ্রামী জনগণের অংশ।

এই সংগ্রামী জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাঁদেরকে বিভক্ত ও বিপথগামী করার চক্রান্ত হিসেবেই তারা অসংখ্য লিফলেট প্রচার করে নানা ধরনের মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রচার করছে কমিউনিস্টরা দাড়িওয়ালা ও টুপিপরা লোকজনদের দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এবং বেইজ্জত করছে। কমিউনিস্টদের কর্মসূচীর সঙ্গে দাড়ির কোন শত্রুতা নেই। সকলেই জানেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, হোচিমিন, ক্যাস্ট্রোর মতো বিশ্ববিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতাদেরও দাড়ি ছিলো এবং আছে। কাজেই দাড়িওয়ালাদের দাড়ি কামানোর মতো কোন ছোট জাতের কর্মসূচী কোন কমিউনিস্ট কর্মসূচী হতে পারে না। এ কর্মসূচী হতে পারে জামাতীদের নিজেদেরই। তারা পাকিস্তানী আমলেও একাজ করেছিলো। নিজেরাই নিজেদের লোকের দাড়ি কামিয়ে টুপি ছিঁড়ে ফেলে, মসজিদে

নিজেদের ভাড়া করা লোক দিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে, এমনকি কোরআন পুড়িয়ে, কোরআনের পাতা ছিঁড়ে তার দায়-দায়িত্ব "কমিউনিস্ট," "ভারতীয় দালাল" প্রভৃতির ওপর চাপাবার চেষ্টা করেছিলো। এইভাবে তারা জনগণের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলো যে, পাকিস্তান বিরোধীরা ইসলামের দুশমন, ধর্মবিরোধী, কাজেই জনগণের উচিত তাদের বিরোধিতা করা।

কিন্তু জনগণ তৎকালীন আন্দোলনের সময় সঠিকভাবেই ধর্মকে এইভাবে ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। আন্দোলনকারীরা যে জনগণ কর্তৃক ধর্ম পালনের বিরোধী এ প্রচারণা প্রত্যাখ্যান করে তারা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবারও জামাতে ইসলামী জনগণকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। গণআদালতের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তিকে তারা ধর্মের বিপক্ষ ও পক্ষ শক্তি হিসেবে জনগণের কাছে উপস্থিত করতে চাইছে। ঠিক পাকিস্তানী আমলে যেমন এই প্রচারের দ্বারা কোন কাজ হয়নি, তেমনি এবারও তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। জামাতে ইসলামীর এই বিভেদ ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা জনগণ নিজেদের সংগ্রামের মাধ্যমেই প্রত্যাখ্যান করবেন।

২৩.৩.১৯৯২

দৈনিক আজকের কাগজ
২৫ মার্চ ১৯৯২

গণআদালত ও 'গণতান্ত্রিক' সরকার

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যথাসময়ে ২৬শে মার্চ জামাতে ইসলামীর আমীর গোলাম আজমের বিচার গণআদালত কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিচার উপলক্ষে ঐদিন সকাল থেকেই শত শত ছোট-বড়ো মিছিল বের হয়। ১৯৭১-এর ঘাতক, দালাল, তৎকালীন পাকিস্তানী সরকার ও সেনাবাহিনীর নিকৃষ্টতম গণবিরোধী কার্যকলাপ এবং অপরাধের সহযোগী, গোলাম আজমের মৃত্যুদণ্ডের দাবী জানিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে সেগুলি আদালত স্থলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সরকার এই বিচারের বিরোধী হওয়ার ফলে পুলিশের সঙ্গে মিছিলকারীদের কিছু কিছু সংঘর্ষ হলেও পুলিশ খুব বড়ো ধরনের কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। সে বাধা সৃষ্টি করলে পরিস্থিতি যে সম্পূর্ণভাবে সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। গণআদালতে গোলাম আজমের বিচারের যে রায় দেওয়া হয় সে রায় সারা দেশের জনগণ প্রকৃতপক্ষে অনেক আগেই দিয়েছেন। ১৯৭১ সালেই সে রায় খুব সুস্পষ্টভাবেই জনগণ সে সময়ে প্রদান করেছেন এবং পরবর্তী কোন সময়েই তা প্রত্যাহার করা হয়নি।

শুধু গোলাম আজম নয়, জামাতে ইসলামীর অন্যান্য অনেক নেতা যেমন আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, 'মাওলানা' মান্নান, দেলওয়ার হোসেন সাঈদী প্রভৃতি গণশত্রুরা ইসলামের নামে ভণ্ডামী করে যেভাবে ১৯৭১ সালে নানা অপরাধের সঙ্গে সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলো সেইসব অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধেও জনগণের রায় সে সময় খুব স্পষ্ট এবং উচ্চারিত ছিলো। তাদের বিরুদ্ধেও এই রায় এ দেশের সংগ্রামী জনগণ প্রত্যাহার করেননি।

কিন্তু জনগণ প্রত্যাহার না করলেও ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশে যে নোতুন বাঙালী শোষক শ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলো তারা গোলাম আজমসহ জামাতে ইসলামীর অন্যান্য অপরাধী নেতাদের বিরুদ্ধে জনগণের এই রায়কে অগ্রাহ্য করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করে ধীরে ধীরে তাদেরকে সমাজে অর্থনৈতিক জীবনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসিত করেছে। এখন জামাতে ইসলামী একটি সংগঠন হিসেবে যেটুকু শক্তি সঞ্চয় করেছে তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না যদি নোতুন বাঙলাদেশ রাষ্ট্রে একের পর এক সরকার ১৯৭২ সাল থেকেই জামাতের বিরুদ্ধে এবং সেই ধরনের অপরাপর ঘাতক দালাল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের রায় অগ্রাহ্য করে তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য না করতো, এ

ব্যাপারে আওয়ামী-বাকশালী সরকার, মুশতাক ও সায়েমের সরকার, জিয়াউর রহমানের সরকার, এরশাদের সরকার এবং "গণতান্ত্রিক" সরকার বলে দিবারাত্রি অকারণে চিৎকারকারী বর্তমান বিএনপি এ দেশের শোষক শ্রেণীর সরকারী প্রতিনিধিরূপে বেশ পরিকল্পিতভাবেই জামাতে ইসলামীর সহযোগী হিসেবে কাজ করে এসেছে।

এই সহযোগীদের মধ্যে এখন অনেকেই ভিড় ঠেলে সামনের কাতারে জামাতবিরোধী ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসছে। তাদেরকে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। উপরন্তু তাদের এই এগিয়ে আসাটা সংগ্রামের দিক থেকে সুবিধাজনক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার তা হলো, এগিয়ে এসে তারা যেন সমগ্র আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি দখল করতে না পারে। সেভাবে যদি তারা আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি দখল করে তা হলে তারা তাদের শ্রেণীস্বার্থেই আবার নোতুন করে জনগণের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলনকে ব্যবহার করবে।

এ কথা বিশেষভাবে বলা দরকার যে, ১৯৭৩-৭৪ সালে যে আওয়ামী লীগ জামাতীদের 'মানবিক' কারণে ক্ষমা করে দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেছিলো তারাই এখন দেরিতে হলেও এগিয়ে আসছে গোলাম আজমের বিচার করতে। এমনভাবে তারা এগিয়ে আসছে যাতে মনে হবে যে, এ বিচারের সুযোগ আগে তাদের নিজেদের ছিলো না। মনে হবে, এই প্রথমবারই তারা জামাতীদের হাতের কাছে পেয়েছে।

এ কথা সত্য যে, ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত গোলাম আজম এ দেশে ছিল না। কিন্তু তাদের অন্য নেতারা এখানে ছিলো, তাদের অনেককেই আটক করা হয়েছিলো, অনেকের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে আরও যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো, ১৯৭২ সালে জনগণ তাদের বিচার দাবী করেছিলেন প্রচলিত আদালতে এবং নিজেরা তাদের কৃত অপরাধের জন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা ছিলো মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েও এবং লক্ষ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে অগণিত নারী, পুরুষের ইজ্জতের বিনিময়ে, জনগণের ব্যাপক অংশের উপরে সব ধরনের নির্যাতনের বিনিময়ে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছিলো, যে শ্রেণীটি ক্ষমতায় এসেছিলো তারা অপরাধীদের বিচার করেনি। উপরন্তু 'মানবতার' পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তারা তাদেরকে ক্ষমা করেছিলো। এ ধরনের মানবিকতার বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথ তার ঈশ্বর বা জীবন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, "তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো, তুমি কি বেসেছো ভালো?"

২৬শে মার্চ যে গণআদালতে গোলাম আজমের বিচার হলো সে আদালতকে বেআইনী ঘোষণা করে বর্তমান সরকার একটি নির্বাচিত 'গণতান্ত্রিক' সরকার হিসেবে নিজেই গোলাম আজমের বিচার করার 'ইচ্ছে' প্রকাশ করেছেন। সরকার বলেছেন যে,

যেহেতু তাঁরা এখন গোলাম আজমকে কারারুদ্ধ করেছেন এবং তার বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সে জন্যে গণআদালতের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, গণআদালত নাকি 'গণতান্ত্রিক' সরকার ও প্রচলিত আইন ব্যবস্থার প্রতি হুমকিস্বরূপ। গণআদালত যে শাসনতন্ত্রবিরোধী এ সব আওয়াজ সরকার পক্ষ থেকে তোলা হচ্ছে।

এই সবই অর্থহীন বাগাড়ম্বর এবং ভাঁওতাবাজি বলে মনে হবে যখন দেখা যাবে যে, গোলাম আজমকে আটক করা হয়েছে ১৯৭১ সালে তার কৃত বিভিন্ন ঘোরতর অপরাধের জন্য নয়, বিদেশী আইনে তাকে আটক করা হয়েছে। বিদেশী হয়েও ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে জামাতের আমীর হওয়ার জন্যে। এ কাজটিও করা হয়েছে এতদিন পর গণআদালতের চাপেই, নিজেদের উদ্যোগে নয়।

এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো, ১৯৭১ সালে গোলাম আজমের ভূমিকা এবং তার কৃত অপরাধ। যে অপরাধ একবিন্দু লাঘব হয় না যদি গোলাম আজম বাঙলাদেশের নাগরিক হয়, যেমন এ দেশের নাগরিক আব্বাস আলী খান, দেলওয়ার হোসেন সাঈদী, 'মাওলানা' মান্নান যেমন এ দেশের নাগরিক ও সংসদ সদস্য মতিউর রহমান নিজামী প্রভৃতি। এদের এই নাগরিকত্ব এবং সংসদ সদস্য হওয়ার ফলে এদের অপরাধের বিচার স্থগিত রাখা যায় না অথবা দেশী নাগরিক হিসেবে দেশীয় আইন অনুযায়ী তাদেরকে রেয়াত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সেই রেয়াতই তাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং 'গণতান্ত্রিক' সরকার গোলাম আজমকে শুধু বিদেশী আইনে আটক করে এই মতলব কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়েছে।

কাজেই বর্তমানে 'গণতান্ত্রিক' সরকার হিসেবে নিজেদের গৌরব কীর্তনকারী প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদেরকে এখানেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। তাদেরকে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে অন্যান্য অসংখ্য অভিযোগ—হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ব্যাপারে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগও আইনগতভাবে আনতে হবে যেভাবে এরশাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আইনগতভাবে উত্থাপন করা হয়েছে।

শুধু এটাই নয়, গোলাম আজমকে যে দল সব কিছু জেনে শুনে নিজেদের আমীর নির্বাচিত করছে সেই দল এবং দলের অন্যান্য অপরাধী নেতাদের বিরুদ্ধেও একই রকম অভিযোগ সরকারীভাবে আদালতে উত্থাপন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন গাফলতি ঘটলে বর্তমান 'গণতান্ত্রিক' সরকারকে যেভাবে গণআদালতের মাধ্যমে জনগণ বাধ্য করেছেন গোলাম আজমকে জেলখানায় পাঠাতে ও তার বিচারের ব্যবস্থা করতে ঠিক সেভাবেই এই 'গণতান্ত্রিক' সরকার যে পরবর্তী গণতান্ত্রিক পদক্ষেপের জন্য, অন্যদের বিচারের জন্য, আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ বাধ্য করবেন। এই হলো, বর্তমান 'গণতান্ত্রিক' সরকার এবং গণআদালতের পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের কথা মনে রেখেই এখন থেকে গণআদালতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা না করে এবং তার

বিরোধিতা না করে ঐ 'গণতান্ত্রিক' সরকারকে কাজ করতে হবে। এর অন্যথা হলে এ দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে তাতে এই বিচারের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই জনগণ নোতুন করে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

২৭.৩.১৯৯২

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ
২ এপ্রিল ১৯৯২

এতদিন কোথায় ছিলেন?

জামাতে ইসলামীর আমীর গোলাম আজমকে ২৪শে মার্চ রাত্রে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সরকার বলছেন, তাঁরা গোলাম আজমকে বিদেশী আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করেছেন কারণ তিনি একজন অন্যদেশী হয়ে অথবা এ দেশের নাগরিক না হয়ে এ দেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন।

এটিই যদি গোলাম আজমের একমাত্র অপরাধ হয়ে থাকে তাহলেও বলা চলে যে, বিগত ডিসেম্বর মাসে জামাতে ইসলামীর উপরোক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলেও এতদিন তাকে ধরা হয়নি কেন? এতদিন সরকার এবং তাঁদের দ্বারা প্রতিপালিত আইনের রক্ষকরা কোথায় ছিলেন?

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অন্যান্য অপরাধের কথা বাদ দিলেও একজন অনাগরিক হিসেবে বাঙলাদেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচিত হওয়া একটি সংবিধান-বিরোধী কাজ। এই সংবিধান বিরোধী কাজ গোলাম আজম এবং জামাতে ইসলামীরা করলেও সরকার কেন তাদের বিরুদ্ধে আগে কোন পদেক্ষপ গ্রহণ করেননি এবং এখন কেন তাঁরা সে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন?

এ প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই গণআদালতের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং ভূমিকা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, এমনকি সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও যে কতখানি তার জবাব পাওয়া যাবে।

গণআদালতকে সরকার, জামাতে ইসলামী এবং ঐ ধরনের সব ধর্ম-ব্যবসায়ী রাজনৈতিক দল ও তাদের সমর্থকরা 'প্রচলিত আইনের বিরোধী,' 'সংবিধান-বিরোধী,' 'ন্যায় নীতি বিরোধী' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করে বেআইনী ঘোষণা করেছেন এবং ২৬শে মার্চের কর্মসূচী প্রত্যাহার করতে বলেছেন। সরকারের যুক্তি ছিলো এই যে, গোলাম আজমকে কেন্দ্র করেই যেহেতু গণআদালতের ব্যবস্থা সেজন্য তাকে আটক করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাবার পর সে আদালতের আর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। এই যুক্তি যে কতো বড়ো ভুল সেটা বোঝা যাবে যখনই আমরা দেখবো কখন ও কি কারণে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে ঐ পদক্ষেপ নেওয়া হলো এবং ইতিপূর্বে কেন সে পদক্ষেপ আইনানুগভাবে গ্রহণ করা হয়নি।

ইতিপূর্বে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি দেশের সংবিধানবিরোধী কার্যকলাপ সত্ত্বেও কারণ সরকার এই ধর্ম-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। কারণ তারা এদের ধর্ম ব্যবসা

থেকে নিজেরা যথেষ্ট ফায়দা উঠিয়ে থাকে। এই সরকার নিজেও ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমানে ব্যবহার করে চলছে। এদের নির্যাতনে রেডিও-টেলিভিশন অধিকাংশ সময়েই লোকজনকে বন্ধ রাখতে হয়। নিকৃষ্ট ধরনের ধর্মীয় প্রোগ্রাম রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করে তারা ইসলামের নামকেও কলঙ্কিত করেছে। এই কাজ সরকার যাদেরকে দিয়ে করিয়ে চলছে তাদেরও অধিকাংশ জামাতে ইসলামীর লোক অথবা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

২৪শে মার্চ সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী গোলাম আজমকে গ্রেফতার করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে গণআদালত আন্দোলনের, প্রয়োজন হয়েছে 'অসাংবিধানিক' পদ্ধতিতে জনগণকে জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং আন্দোলিত করার। অর্থাৎ সাংবিধানিক আইন নিজের মাহাত্ম্যে এখানে কার্যকর নয়। তাকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন জনগণের ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলনের। এদিক দিয়ে বিচার করলে 'অসাংবিধানিক' আন্দোলনের সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা খুব পরিষ্কার।

এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, শুধু এই ধরনের সাংবিধানিক ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য আইন ও চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। সরকার শ্রমিকদের সঙ্গে কোন চুক্তি করলে সেটা যে কার্যকর হবে তার কোন নিশ্চয়তা বাঙলাদেশে নেই। চুক্তির জন্য যেমন প্রয়োজন হয় আন্দোলনের, তেমনি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্যও প্রয়োজন দেখা দেয় শ্রমিক আন্দোলনের। এটাই হলো বাঙলাদেশের লুটপাটকারী বুর্জোয়াদের শ্রেণী চরিত্র।

এই শ্রেণী চরিত্রের দিকে খেয়াল রাখলেই সরকারী ও বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের কাজকর্মের ধারা ও সঠিক চরিত্র সহজেই বোঝা যায়।

এত কথা বলার প্রয়োজন হলো এজন্য যে, ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল গণজমায়েতে গণআদালত যে রায় প্রদান করেছে, সে-রায় কার্যকর করার কোন প্রকৃত ইচ্ছা এই সরকারের নেই। জনগণের এই আন্দোলন যদি অব্যাহত না থাকে, তথাকথিত অসাংবিধানিক কর্মসূচী যদি আন্দোলনের মাধ্যমে জারী না রাখা যায় তাহলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ আবার তাদের পূর্ব অবস্থানে ফিরে যাবে এবং তাদের নিজেদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পর্যন্ত শিকেয় তুলে গোলাম আজম ও জামাতে ইসলামীকে সাধ্যমতো ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এই ছাড়ের ব্যাপারটি শুধু গোলাম আজমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। অন্য যেসব জামাত নেতা গোলাম আজমকে নিজেদের দলীয় প্রধান বা আমীর নির্বাচনের জন্য দায়ী তারাও সাংবিধানিকভাবেই শাস্তিযোগ্য। তাছাড়া তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীও বটে। গোলাম আজমের থেকে তাদের অপরাধ কিছু কম নয়। শুধু বাঙলাদেশের নাগরিক বলেই তাদের এই সব সাংবিধানিক অপরাধ অথবা যুদ্ধাপরাধ মাফ হওয়ার কোন কারণ নেই।

এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য এ কারণে যে, প্রতিক্রিয়াশীল জামাতে ইসলামীর নেতারা এখন মরিয়া হয়ে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সব রকম মিথ্যা প্রচারণা জোরদার করেছে। নিজেদের সম্পর্কেও তারা বেপরোয়া হয়ে এখন মিথ্যা প্রচারে নেমেছে। এই প্রচারের মধ্যে সব থেকে ঘৃণ্য হলো, বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জামাতে ইসলামীর ইতিবাচক অবদান (মতিউর রহমান নিজামী) এবং বাঙলাদেশের অস্তিত্ব ইসলামের উপর নির্ভরশীল (আব্বাস আলী খান) এই মর্মে জামাতে ইসলামী নেতাদের ২৬শে মার্চ পরবর্তী দুই-এক দিনের বক্তৃতা বিবৃতি। ইসলামের নাম নিয়ে এতো সব বড়ো ধরনের মিথ্যা বলতেও এদের কোন অসুবিধা নেই। এই সব মিথ্যাচারণের মধ্যে ঈমানদারীর পরিচয় কোথায়?

বিগত ২৭শে মার্চ শুক্রবার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সামনে এক নামাজ-উত্তর জনসভায় (এভাবেই তারা বায়তুল মোকাররম মসজিদকে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করছে) জামাত নেতা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন যে, গোলাম আজম নাকি মার্কিন পেন্টাগণ বা সামরিক প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রেফতার হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই দালালদের এ বক্তব্য শুনে মনে পড়ে সেই চোরের কথা, যে গৃহস্থের বাড়ী চুরি করতে এসে ধরা পড়ার পর গৃহস্থের 'চোর চোর' চিৎকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেও 'চোর চোর' বলে চিৎকার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে পলায়ন করার চেষ্টায় ছিলো। বর্তমান সরকার প্রকৃতপক্ষে জনগণের আন্দোলনের চাপেই, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ফলেই গোলাম আজমকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছেন, সেই বিষয়টি আড়াল করার জন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চিরদিনকার দালাল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল সউদী রাজতন্ত্রের দালাল জামাতে ইসলামীর নেতাদের এই বক্তব্য। এ বক্তব্য যে জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

২৬শে মার্চ গণআদালতে যে রায় প্রদান করা হয়েছে, সে রায় বাঙলাদেশের জনগণ প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালেই প্রদান করেছিলেন। সেই হিসেবে এটা নোতুন কোন রায় নয়। একের পর এক সরকার আওয়ামী-বাকশালী থেকে বর্তমান বিএনপি সরকার পর্যন্ত কেউই জনগণের সেই রায় কার্যকর না করার জন্যই এখন নোতুনভাবে সেই রায় কার্যকর করার আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলন শুধু জামাতে ইসলামীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তাই নয়, বর্তমান সরকারকেও তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সক্রিয় করতে আংশিকভাবে হলেও সফল হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের আশু দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনের প্রথমেই গোলাম আজম, জামাতে ইসলামী ইত্যাদি বিষয়ে সাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শুধু বিদেশী নাগরিকত্বের কারণেই নয়, অন্যান্য কারণেও অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থা সংবিধান এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী করা। এই কাজ অসম্পূর্ণ রাখলে অথবা দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে শুধু যে এদেশে

'অসাংবিধানিক' রাজনীতি এবং আন্দোলন আবার শুরু হবে তাই নয়, যে সংবিধান কার্যকর করা যায় না সেটা আমূলভাবে পরিবর্তন করার গণতান্ত্রিক সংগ্রামও এর মাধ্যমেই দ্রুত বিকশিত ও শক্তিশালী হবে।

২৮.৩.১৯৯২

দৈনিক ভোরের কাগজ
১ এপ্রিল ১৯৯২

গোলাম আজমের বিচার প্রসঙ্গ সামনে এলো কেন?

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী কয়েক বছরে জামাতে ইসলামী নেতা গোলাম আজম অনেক অপরাধে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও জিয়ার বি.এন.পি. সরকারের আমলে বাঙলাদেশে এসে নোতুন করে ঘাঁটি গড়ার পর এতদিন পর্যন্ত তার বিচারের প্রসঙ্গটি সামনে আসেনি। এখন সে প্রসঙ্গ সামনে কেন এল, এ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করছেন। প্রশ্নটি অসঙ্গত অথবা অযৌক্তিক নয়। তবে যা দরকার তা হলো বিচারের বিরোধিতা করার জন্য প্রশ্নটির আলোচনা নয়। বিচারের বিষয়টি যে আমাদের দেশের সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এটা বোঝার জন্যই এ সম্পর্কে আলোচনা দরকার।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, জামাতের অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার মূল দিকটি হলো জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং তাদের নানা জরুরী দাবী-দাওয়ার আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে জামাত কর্তৃক ধর্মকে, এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা। ধর্মের এই রাজনৈতিক ব্যবহারটি জামাতের মূল অপরাধ, তাদের নেতাদের আসল চক্রান্ত। এ কাজে তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে সউদী আরবের রাজতন্ত্র (যারা সম্প্রতি কোরআনের একটি আয়াত সউদী আরবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইসলামকে চরম অবমাননা করেছে) থেকে সব রকম দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল-শক্তির এজেন্ট এবং খেদমতগার। এরা নিজেরা এই ধরনের দালাল হওয়ার কারণেই যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই এরা কথায় কথায় ভারতীয় দালালদের কীর্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বাজিমাত করতে চায়। এটা তাদের অনেক পুরাতন কৌশল। কিন্তু জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যে যেহেতু ভারতের দালাল হওয়ার কোন প্রয়োজনই হয় না সেজন্য অতীতে পাকিস্তানী আমলে যেমন তাদের এই প্রচারণা ব্যর্থ হয়েছে তেমনি এখনো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তাই হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই।

জামাতে ইসলামীর নেতাদেরকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব "মানবিক কারণে" জেল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিয়ে এবং দেশ গড়ার কাজে তাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন সেই ক্ষেত্রের উপর দাঁড়িয়েই মুশতাক দালাল আইন রদ করেছিলেন এবং জিয়াউর রহমান সংবিধান সংশোধন করে জামাতে ইসলামীসহ রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

এভাবে উৎসাহ এবং অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে জামাতে ইসলামী ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু হয়েছে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও প্রভৃতি মার্কসবাদী শিক্ষকরা এবং সেই সঙ্গে ডারউইনের মতো বিজ্ঞানীরাও। কারণ জামাতে ইসলামী সকল প্রকার প্রগতিশীলতার বিরোধী হওয়ার কারণে তারা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করতেও চরিত্রগতভাবে বাধ্য।

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার অবশ্য শুধু যে জামাতে ইসলামীই করে আসছে তাই নয়। নিজেদের শ্রেণীগত ও দলীয় স্বার্থে আওয়ামী লীগ, বি.এন.পি., সি.পি.বি. এবং একাধিক নির্বাচনপন্থী বামপন্থী দল ও জোট এই একই অপকর্ম করে আসছে। বিশেষত নির্বাচনের সময়ে তাদের দ্বারা ধর্মের ব্যবহার বেশ খোলাখুলিভাবে দেখা যায়। এরশাদ এসব লক্ষ্য করেই ইসলামকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম করার মতো দুষ্কর্ম করতে সাহসী হয়েছিলেন। এভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা দ্বারা এদেশের মুসলমানদের কোন উপকার হয়নি, উপরন্তু তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই তারা এ কাজ করেছিলো। এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম বিলের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিলো তার মাধ্যমে এ বিষয়টি জনগণের কাছে অনেক পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছিলো।

কিছু লোক আছে যারা বিভিন্ন কারণে গোলাম আজমের বিচার দাবীকে এবং জামাত বিরোধিতা করা সত্ত্বেও সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে উচ্চবাচ্য করতে নারাজ। তারা এই সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের বিরোধী। কেন তারা এর বিরোধী সেটা তাদের শ্রেণী চরিত্র লক্ষ্য করলেই বোঝার অসুবিধা হয় না এবং সে কারণেই এক্ষেত্রে শ্রেণী প্রশ্নের অবতারণা তাদের গায়ে বেশ জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু তাদের ঐ প্রতিক্রিয়া যেমন স্বাভাবিক তেমনি সমগ্র জামাত বিরোধী আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্রটিও খুব স্বাভাবিক এবং তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ঠিক এ কারণেই জামাত বিরোধিতা তারাই সঠিকভাবে এবং কোন রকম আপোষ না করে চালিয়ে যেতে পারে যারা রাজনীতিকে শ্রেণী সংগ্রামেরই প্রতিফলন হিসেবে দেখে এবং মেহনতি জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার জন্যে সর্বতোভাবে নিয়োজিত থাকে। অন্য কোন ধান্ধাবাজি বা মতলববাজির কারণে তারা এটা করে না।

এই মতলববাজির কথা এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার এ জন্য যে, একটি বড়ো বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল গোলাম আজমের বিচারের ব্যাপারটিকে দলীয় রাজনীতির গাঁটছড়ায় বেঁধে ফায়দা ওঠাবার নানা ধরনের চক্রান্ত করছে এবং ইতিমধ্যেই তারা এমন সব কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে যা জামাত বিরোধী আন্দোলনকে দলীয়করণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ আন্দোলনকে বিভ্রান্ত বিভক্ত ও বিপথগামী করারই এক অপচেষ্টা মাত্র।

২৬শে মার্চ গোলাম আজমের বিচার চলাকালে জাহানারা ইমামের কাছে শেখ হাসিনার চিঠি এবং তার শত শত ফটো কপি সাংবাদিকসহ অন্যদের মধ্যে বিলি করে আওয়ামী লীগ তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক অপকর্মের মতো আর একটি অপকর্ম করেছে। এর দ্বারা তারা বোঝাতে চেয়েছে যে, তাদের প্ল্যান অনুযায়ীই সব

কাজ হচ্ছে, তাদের উদ্যোগেই লোকজন লাখে লাখে জড়ো হচ্ছে ইত্যাদি। অথচ সত্যি ঘটনা হলো এই যে, গোলাম আজমের বিচারের বিষয়টি যখন জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে, চারদিকে প্রস্তুতি কমিটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে এবং এই বিচারকে কেন্দ্র করে একটা আলোড়ন সৃষ্টির মতো পরিস্থিতি হয়েছে একমাত্র তখনই শেষ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ এক রকম বাধ্য হয়ে এতে যোগ দিয়েছে এবং এমনভাবে দুর্নীতি ও অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে যা কোন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল আন্দোলনের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে করিতে পারে না। সেটা একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন করতে পারে হীন দলীয় উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে। এই ধরনের দলীয় চক্রান্ত এবং তৎপরতা ভবিষ্যতে যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে বর্তমান আন্দোলন বিপথগামী হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

জামাতের আমীর গোলাম আজমের বিচারের প্রসঙ্গটি কেন এই মুহূর্তে সামনে এলো এবং কতিপয় আপাতদৃষ্টিতে "অরাজনৈতিক" অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যক্তির উদ্যোগে ও আহ্বানে কেন এই আন্দোলনের সূত্রপাত ও দ্রুত বিকাশ ঘটলো সেটা বোঝার জন্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং মেহনতি জনগণের দাবী-দাওয়ার বিরুদ্ধে ধর্মকে ব্যবহার করার বিষয়টিই সব থেকে বেশী বিবেচনার যোগ্য। আগেই বলা হয়েছে যে, শুধু জামাতে ইসলামীই নয় অপরাপর বাম ও দক্ষিণ বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোও নিজেদের মতো করে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করে এসেছে। এদিক দিয়ে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য আছে যে ঐক্য শ্রেণীগত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এইভাবে ধর্মের ব্যবহার বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো করে এলেও জনগণ ধর্মের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে দিন দিন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। তাঁরা দেখছেন ধর্মকে ব্যবহার করে কিভাবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের দাবী দাওয়া ধামাচাপা দিচ্ছে, কিভাবে তারা লুটপাটের মাধ্যমে নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করছে। জামাতে ইসলামীই ধর্মের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ব্যবহার করছে, এ কারণে জামাতের বিরুদ্ধেই জনগণের বিক্ষোভ সবচেয়ে বেশী। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাদের ভূমিকার প্রশ্ন। শুধুমাত্র ১৯৭১ সালে তাদের অপরাধের বিষয়টি বাঙলাদেশে নিজস্ব কারণে জনগণের মধ্যে কিছুতেই এমন বিক্ষোভ এবং আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতো না যে বিক্ষোভ এবং আলোড়ন ২৬শে মার্চ গোলাম আজমের বিচারের জন্যে গণআদালতে দেখা গেছে। এর সঙ্গে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার যুক্ত হওয়ার কারণেই এবং ধর্মকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের বিরুদ্ধেই জনগণ এভাবে আন্দোলিত ও সংগঠিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন। হঠাৎ করে বিশ বছর পর গোলাম আজম এবং জামাতে ইসলামীর ব্যাপারটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়নি।

জনগণ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সহ্য করে আসছিলেন একথা ঠিক। কিন্তু গোলাম আজমের মতো এক অপরাধী এবং বাঙলাদেশের নাগরিক নয় এমন এক

ব্যক্তিকে এদেশের জামাতে ইসলামী তাদের আমীর নির্বাচিত করায় স্পষ্টতই বলা চলে যে, জনগণের সহ্য ক্ষমতা একটি প্রান্ত স্পর্শ করেছে, একটি Saturation point-এ উপনীত হয়েছে। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এভাবে জনগণের সহ্য ক্ষমতার প্রান্ত স্পর্শ করার কারণেই এই মুহূর্তে জামাতের বিরুদ্ধে জনগণ এইভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, অন্য যেসব রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধামতো ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করে—আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে বামপন্থী নামে পরিচিত কিছু নির্বাচনপন্থী দল—তারাও এখন এ ব্যাপারে পিছিয়ে গেছে। এই পিছিয়ে যাওয়া সাময়িকভাবে হলেও এটা এক লক্ষণীয় ব্যাপার।

গোলাম আজমের বিচার প্রসঙ্গে অনেক চতুর সমালোচক একে গুটিকতক লোকের দ্বারা প্ররোচিত এবং জনবিচ্ছিন্ন বলে আখ্যায়িত করে একে কিছুসংখ্যক বড়ো লোক বা elite শ্রেণীর ব্যাপার বলে হেয় করার চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে। তাদের জানা দরকার যে, আমাদের মতো দেশে এ ধরনের আন্দোলন শিক্ষিত ও তথাকথিত ভদ্র সমাজের অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোকেদের দ্বারাই শুরু হয় (ছাত্ররাও এই মধ্যবিত্তেরই অন্তর্গত)। কারণ সাধারণভাবে লোকজন অশিক্ষিত এবং পশ্চাৎপদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্দোলনের ক্ষেত্র যদি প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের লোকদের আহ্বানেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবলভাবে হতে পারে এবং হয়েও থাকে। বর্তমান জামাত বিরোধী আন্দোলন তারই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

আওয়ামী লীগসহ অপর দুই একটি অপেক্ষাকৃত বড়ো দল শ্রমিকসহ জনগণের বিভিন্ন অংশকে আন্দোলনে পরিকল্পিতভাবে টেনে না এনে পরিকল্পিতভাবে বাইরে রাখার চেষ্টা করলেও জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেভাবে আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন তাতে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, শুধুমাত্র গুটিকয়েক বুদ্ধিজীবী অথবা অরাজনৈতিক ব্যক্তি এমন ম্যাজিক দেখাতে সক্ষম যাতে এ ধরনের একটি আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে শোষক শ্রেণীগুলোকে আঘাত করতে পারে। উপরন্তু অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা শুরু হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন জনগণকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করতে সমর্থ হওয়ার কারণেই আওয়ামী লীগের মতো সংগঠন শেষ মুহূর্তে দৌড়ে এসে এতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের চরিত্র অনুযায়ী আন্দোলনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

বর্তমানে গোলাম আজম এবং অপরাপর ধর্ম ব্যবসায়ী যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন চলছে তাকে জনগণের বর্তমান চেতনা এবং আন্দোলনের প্রস্তুতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে

একদিকে যেমন এই আন্দোলনের কারণ ও এ যাবৎকাল তার সাফল্য সম্পর্কে কিছু বোঝা যাবে না, তেমনি এই আন্দোলনকে অধিকতর ও বৃহত্তর সাফল্যের দিকে চালনা করাও সম্ভব হবে না।

২৯.৩.১৯৯২

দৈনিক আজকের কাগজ
১ এপ্রিল ১৯৯২

*জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের গণতান্ত্রিক চরিত্র

জামাতে ইসলামীর নব নির্বাচিত আমীর গোলাম আজমের গণআদালতে বিচার এবং সাধারণভাবে জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বর্তমান আন্দোলন যে বাঙলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই একটি বিশেষ রূপ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ জামাতে ইসলামী ধর্মের নামে প্রকৃতপক্ষে যাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তারা জনশত্রু ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে জামাতে ইসলামীর নেতারা এ দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও ইসলামের নীতি ও কর্মধারার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের প্রতি ব্যাপক মুসলমান জনগণের দুর্বলতা এবং তাঁদের জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্দশার থেকে সৃষ্ট হতাশাকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় গদগদভাবে ধর্মের নামে জামাতে ইসলামীর লোকেরা যতোই নিজেদের প্রচার কাজ চালিয়ে যাক তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নেই যার দ্বারা মনে হতে পারে যে, তারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের পাবন্দ অথবা সৎ জীবনযাপন করা লোকজন। ধন সম্পত্তির প্রতি লোভ, সম্পত্তির মালিকানা, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি কোন কিছুর মধ্যেই এদের পারলৌকিকতার কোন চিহ্ন নেই। পরকালের কথা এরা বলে থাকে পশ্চাৎপদ চেতনাসম্পন্ন লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। এ কারণে এদের সঙ্গে বাঙলাদেশের অন্য সব জনশত্রুদের কোন শ্রেণীগত পার্থক্য নেই। লুটতরাজ ও ঠকবাজি করে এ দেশে যারা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে তাদের মতো এরাও শ্রমজীবী জনগণের, সকল ধরনের মেহনতি মানুষের শত্রু।

কাজেই এ প্রশ্ন যদি করা হয় যে, কেন আমরা জামাতে ইসলামীর রাজনীতির বিরোধিতা করবো তাহলে তার জবাবে বলা দরকার যে, সে বিরোধিতা করা এজন্য হবে না যে তারা লোকদেরকে নামাজ রোজা পালন করতে বলে অথবা তাদের কিছু লোক দাড়ি রাখে (দাড়ি যে কোন নাস্তিকেও রাখতে পারে এবং রেখে থাকে। কাজেই দাড়ির সঙ্গে ইসলামের প্রতি আনুগত্যের কোন সম্পর্ক নেই)। নামাজ রোজা পালন একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের, এমনকি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেরও কোন বিরোধিতা নেই। তাছাড়া যাঁরা নামাজ রোজা পালন করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোক জামাতে ইসলামের বিরোধী।

জামাতে ইসলামীর বিরোধিতার আসল কারণ হলো তাদের দ্বারা জনশত্রুদের শ্রেণীস্বার্থে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার। ধর্মের এই রাজনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে

তারা পশ্চাৎপদ জনগণের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চেষ্টা করে যাতে তাঁরা শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে, শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে, কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে না পারেন।

জামাতে ইসলামীর এই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বাস্তব কার্যকলাপের জন্যই রাজনৈতিকভাবে তাদের বিরোধিতা করা আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

১১.৪.১৯৯২

পাক্ষিক জনযুগ
২১.৪.৯২

মৌলবাদের বাঙলাদেশী সংস্করণ ঃ জামাতে ইসলামী

ধর্মীয় মৌলবাদের বাঙলাদেশী সংস্করণের সঙ্গে অন্য দেশীয় ধর্মীয় মৌলবাদ, বিশেষতঃ ইসলাম ধর্মীয় মৌলবাদের পার্থক্য আছে।

পার্থক্যের আলোচনার আগে প্রথমে সাদৃশ্যের বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, সব দেশেই ধর্মীয় মৌলবাদ রাজনৈতিকভাবে ধর্মের ব্যবহার করে থাকে। এটা অবশ্য ধর্মীয় মৌলবাদেরই বিশেষত্ব নয়। আমাদের দেশে মুসলিম লীগও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছিলো এবং এখন তাদের কোন কার্যকর অস্তিত্ব না থাকলেও সেদিক থেকে মুসলিম লীগের অবস্থান পরিবর্তিত হয়নি। শুধু তাই নয়, সরাসরি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক অথবা ধর্মীয় মৌলবাদী দল বা সংগঠন না হলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে বাহ্যতঃ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দল নয় এমন দলও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করতে পারে। আমাদের দেশে নির্বাচনের সময় বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং সিপিবিসহ কিছু বামপন্থী দলকেও নানাভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করতে দেখা গেছে। জনগণের পশ্চাৎপদ চিন্তা-চেতনা এবং ধর্মের প্রতি তাদের আনুগত্যকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেই এই ধরনের দলগুলো ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করে থাকে। কোন ধরনের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্ম ব্যবহারের সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক দলের ধর্ম ব্যবহারের একটা মৌলিক পার্থক্য এই যে, অন্যেরা যেখানে নিছক সাময়িক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে সেই রাজ্যের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী দেশ চালাবার কথা বলে। এই ধর্মরাজ্য বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মর্মবস্তু যাই হোক, এই রাজ্য বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েই ধর্মীয় মৌলবাদীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে। সকল দেশের ধর্মীয় মৌলবাদীদের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য।

জামাতে ইসলামীকে এই অর্থে একটি ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাবে যে, ইরান অথবা আলজিরিয়ার মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর একটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের ভিত্তি বাঙলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই প্রোথিত। বাঙলাদেশ জামাতে ইসলামীর চরিত্র এ দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই সৃষ্টি। এ কারণে ইরান এমনকি মিশর, আলজিরিয়া ইত্যাদি দেশের ইসলামী মৌলবাদের সঙ্গে বাঙলাদেশের ইসলামী মৌলবাদী দল জামাতে ইসলামীর পার্থক্য খুব স্পষ্ট।

বাঙলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং গঠন হতে থাকার সময় এ দেশে একটি নব্য ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাঙলায় যেখানে কোটিপতির সংখ্যা ছিলো মাত্র চার-পাঁচ এখন সেখানে কোটিপতির সংখ্যা হাজার হাজার, অনেক হাজার।

এই বাঙলাদেশী কোটিপতিরা এ দেশে কোন উৎপাদনশীল গঠন কাজের মাধ্যমে ধন সঞ্চয় করে ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হয়নি। এদের ধন অর্জনের মূল প্রক্রিয়া প্রথম থেকেই, অর্থাৎ ১৯৭২ সাল থেকেই হচ্ছে লুটতরাজ দোকানপাট, বাড়ীঘর থেকে শুরু করে ব্যাংক লুট করা।

এ দেশে যারা ক্ষমতাসীন হয়েছে তারা উল্টো কাজ করে এলেও প্রথম থেকেই উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলে। কিন্তু জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের সময় "উৎপাদনের রাজনীতি" নামে এক ধরনের শ্লোগান চালু করার চেষ্টা বিশেষভাবে করা হয়। এরশাদের আমলেও "উৎপাদনের রাজনীতির" এই শ্লোগান বজায় থাকলেও এই পুরো সময়ে যারা ক্ষমতাসীন থাকে তারা দেশে উৎপাদনক্ষম এবং উৎপাদনসীন শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব না করে লুটতরাজের মাধ্যমে যারা ধন অর্জন করেছে তাদের ধন অর্জনের প্রক্রিয়া অধিকতর অবাধ করার উদ্দেশ্যেই সরকারী নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন "গণতান্ত্রিক" সরকারের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবেই প্রযোজ্য।

এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাঙলাদেশে যে কোন ধরনের সরকার—সামরিক সরকার, সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচিত সরকার অথবা অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার প্রত্যেকেই এই নব্য ধনিক শ্রেণীর খেদমতগার হিসেবেই কাজ করে এসেছে।

এখানে যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হলো, ১৯৭২ থেকে এ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সরকারের শ্রেণী চরিত্র যেমন অপরিবর্তিত থেকেছে তেমনি এই শ্রেণী চরিত্র ক্ষমতাসীন দলগুলোর বাইরে অন্য বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর চরিত্রকেও গঠন করেছে। বাম অথবা দক্ষিণ যে কোন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এরা প্রত্যেকেই হয় সরাসরি নয়তো পরোক্ষভাবে যে শ্রেণীটির স্বার্থরক্ষা ও সম্প্রসারণ করতে নিযুক্ত থাকে সেটি হলো এক এবং অভিন্ন।

এদিক দিয়ে বাঙলাদেশের সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামী কোন ব্যতিক্রম নয়। বাহ্যতঃ এরা একটা ধর্মীয় অর্থাৎ ইসলামী মৌলবাদী খোলস চড়িয়ে থাকলেও এরা হলো এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, বিভিন্ন পেশাজীবী মেহনতি জনগণের শত্রু এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ধনিক শ্রেণীর খেদমতগার। এ কারণেই সউদী-আরবের রাজতন্ত্র কোরআনের রাজতন্ত্র বিষয়ক আয়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোরআনের অবমাননা করলেও এরা কোরআনের অবমাননা দেখে সউদী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তোলে না। সেখানকার

'রাজতন্ত্র' এদের সর্বপ্রধান বিদেশী পৃষ্ঠপোষক হওয়ার কারণেই যে এমনটি ঘটে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে জামাতে ইসলামী সবক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী হওয়ার কারণে তারা এদেশে সব ধরনের কায়েমী স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। পরবর্তীকালে যাই হোক, সংগ্রামের কালে ইরানের মৌলবাদীদের সঙ্গে এবং ঠিক এ সময়ে আলজিরিয়ার মৌলবাদীদের সঙ্গে বাঙলাদেশের জামাতে ইসলামীর এখানেই তফাৎ।

বাঙলাদেশের জামাতে ইসলামীর নেতারা যতই আখেরাত বা পরকালের কথা বলুক ইহলোকের 'আখেরাত' এরা প্রত্যেকেই গুছিয়ে রেখেছে অথবা গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। এদের জীবিকা ও জীবন-যাপনের সঙ্গে উপরোক্ত অন্য দেশীয় ইসলামী মৌলবাদীদের এদিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য।

এদেশে সব থেকে "জনপ্রিয়" বলে কথিত এক অর্ধশিক্ষিত (সাধারণ শিক্ষা তো বটেই এমনকি ইসলামিয়াত এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এর কোন ধারণা নেই) জামাতী ওয়াজকরনেওয়ালা খুব ব্যস্ত ধর্ম প্রচারক। কিন্তু এই ধর্ম প্রচারক ওয়াজকরনেওয়ালা ইসলামের নামে প্রত্যেক ওয়াজের জন্য বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার টাকা ফি নিয়ে থাকে। এটা তার একটা ব্যবসা। ধর্মীয় মৌলবাদের নামে ব্যবসাদারী বাঙলাদেশের ইসলামী মৌলবাদীদের একটি বৈশিষ্ট্য।

সকলেই যে উপরোক্ত অর্ধশিক্ষিত মৌলভীর মতো ওয়াজ করে ধন অর্জন করে তা নয়। এরা কেউ ব্যাংকের ডিরেক্টর, কেউ হাসপাতালের ডিরেক্টর, কেউ কোন বিদেশী পাইপ লাইনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যেভাবেই হোক, এদের নেতৃত্বের প্রধান অংশটিই এভাবে ইহকালে আখের গোছাতে নিযুক্ত।

অবশ্য জামাতে ইসলামীর মধ্যে কিছু সংখ্যক কর্মী ও নেতা, প্রধানত নিম্ন পর্যায়ের, যে ইসলামের জন্য প্রকৃত আনুগত্যের কারণেই জামাতে ইসলামী করেন তাতে সন্দেহ নেই। এই ধরনের ব্যতিক্রমী কর্মীরা প্রত্যেক বুর্জোয়া সংগঠনেই আছে। এদেরকে ব্যবহার করেই এ ধরনের দলের নেতারা নিজেদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে, বাড়ীঘর তৈরী করে, ব্যাংক ব্যালেন্স গড়ে তোলে।

এসব কারণেই জামাতে ইসলামীকে কোন প্রকৃত ধর্মীয় ব্যক্তিদের সংগঠন মনে করার কোন কারণ নেই। অন্য যে কোন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের মতো এরাও এদেশের শোষক-শাসক শ্রেণীর, লুটতরাজকারী নব্য ধনিক শ্রেণীরই প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, এরা হলো এই ধনিক শ্রেণীর সব থেকে নিকৃষ্ট রাজনৈতিক প্রতিনিধি।

১১.৪.১৯৯২

সাপ্তাহিক আজকের কাগজ
১৬.৪.১৯৯২

মৌলবাদ থেকে সাম্প্রদায়িকতা ঃ
জামাতে ইসলামীর পশ্চাদপসরণ

একটি ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক দল হিসেবে বাঙলাদেশের জামাতে ইসলামীর অনেক সীমাবদ্ধতা ও পিছুটান আছে। এদিক থেকে ইরান, মিশর, আলজিরিয়া ইত্যাদি দেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর উল্লেখযোগ্য চরিত্রগত পার্থক্য আছে।

বাঙলাদেশে ধর্মরাজ্য বা ইসলামী আইন-কানুন চালু করার কথা বলে রাজনীতি করার কারণে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ "পুনরুজ্জীবিত" করার আওয়াজ তোলার জন্য সাধারণভাবে জামাতে ইসলামীকে একটি ধর্মীয় মৌলবাদী দল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাবে যে, এই ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্মনিষ্ঠা প্রশ্নাতীত নয় এবং তাদের জীবিকা অর্জন ও জীবনযাপন পদ্ধতির সঙ্গে ইসলামী রীতিনীতি হিসেবে, ইসলামী সরল জীবন পদ্ধতি বলে তারা যা প্রচার করে তার কোন সম্পর্ক নেই। এই দলের নেতারা সকলেই ধনী ব্যক্তি। এদিক দিয়ে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ইত্যাদি দলের নেতাদের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর নেতাদের কোন পার্থক্য নেই। আবার ঠিক এ দিক দিয়েই ইরানী (সংগ্রামের সময়কার), মিশরী, আলজিরীয় ইত্যাদি ইসলামী মৌলবাদীদের সঙ্গে বাঙলাদেশের এই মৌলবাদীদের বড়ো পার্থক্য। কারণ উপরোক্ত অন্যান্য দেশের মৌলবাদীরা কোন না কোনভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বড়ো সম্পত্তির মালিক নয়। ইরানে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের নেতারা কেউ কেউ সম্পত্তির মালিক হলেও সংগ্রাম চলাকালীন অবস্থায় শাহের শাসন আমলে তাদের সে অবস্থা ছিলো না, তাদের সে চিন্তাও ছিলো না।

কিন্তু এখানকার জামাত নেতারা কেউ ব্যাংক ডিরেক্টর, হাসপাতালের ডিরেক্টর, সংবাদপত্রের মালিক অথবা এ ধরনের কোন দৃশ্য মালিকানা না থাকলেও কোন বিদেশী অর্থ পাইপ লাইনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের মধ্যে আবার যারা অর্ধশিক্ষিত অথবা প্রায় শিক্ষাহীন তারা ফি নিয়ে ওয়াজ অথবা ধর্ম প্রচারের কাজ করে থাকে।

চরিত্রগত এই দুর্বলতার কারণে এদের ইসলামী মৌলবাদী চরিত্রের মধ্যেও কোন দৃঢ়তা নেই। এই দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনার জন্যই এক্ষেত্রে প্রথম বিষয়টি উল্লেখ করতে হলো।

আসলে ধর্মীয় মৌলবাদীরা চরিত্রগতভাবে সাম্প্রদায়িক নয়, যদিও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি এদের বিরূপ মনোভাব থাকে অথবা থাকতে পারে। সাম্প্রয়িকতার আক্রমণের মূল

লক্ষ্যবস্তু যেমন হয় অন্য কোন প্রতিযোগী ধর্মীয় সম্প্রদায় সে ধরনের কোন সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যও ধর্মীয় মৌলবাদীদের থাকে না। এমনকি প্রায়ই অন্য ধর্মীয় লোকদের অথবা সংগঠনের সঙ্গে এদের একটা সহযোগিতার সম্পর্ক থাকে। ধর্মীয় লোকজন হিসেবে অধর্মীয় লোকদের বিরুদ্ধে একই ধরনের বিরূপ মনোভাব থেকে এই ঐক্যবোধ অথবা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাঙলাদেশের জামাতে ইসলামীও এদিক থেকে কোন ব্যতিক্রম ছিলো না। ছিলো না বলা হচ্ছে এ কারণে যে, সম্প্রতি এদের এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা এদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতির চাপে এ পরিবর্তন তাদের ঘটাতে হচ্ছে এবং সেটা এদের উপরোক্ত চরিত্রগত কারণে ঘটানো বেশ সহজই হচ্ছে।

১১ই এপ্রিল বাঙলাদেশ জামাতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর আব্বাস আলী খান বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সামনে এক দলীয় সমাবেশে বক্তৃতার সময় ইসলামী আইন-কানুন প্রবর্তন, ইসলামী আদর্শ অথবা অন্য কোন ইসলামী প্রসঙ্গের ধারে-কাছে না গিয়ে গণআদালতে গোলাম আজমের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডকে উপলক্ষ করে কুৎসিত এক সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করেছেন।

এঁরা নিজেরা খুব ধার্মিক লোক হিসেবে জনগণের সামনে নিজেদেরকে হাজির করেন কিন্তু সেই সঙ্গে নারী প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কুৎসিত যৌন বিষয়ক কথাবার্তা বলতে এঁদের কোন অসুবিধা হয় না। উপরন্তু মনে হয় এই গালগল্প করার ব্যাপারটি বেশ উপভোগ করেন। কাজেই নিউ মার্কেটের কাছে কোন বিউটি পার্লারে কোন মুসলমান মহিলা কোন "হিন্দু" নামধারী যুবকের থেকে কি সেবা লাভ করেছে তার বিশদ বর্ণনা জামাত নেতা আব্বাস আলী খান বেশ সুখানুভূতির সঙ্গে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। কোন "হিন্দু" যুবকের কাছে বোমা ছিলো এবং তা বিস্ফোরণের ফলে কি "ঘটেছে" তার বিবরণও তিনি দেন। এ সব কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো এটা বলা যে, এ দেশে হিন্দুরা এখন খুব তৎপর হয়েছে এবং এই হিন্দুরা আবার না কি ভারতের লোক। ভারত থেকে এখানে এসে এরা গণআদালত সংগঠিত করেছে এবং ভারতের সঙ্গে বাঙলাদেশকে একীভূত করার রাজনৈতিক চক্রান্তে লিপ্ত আছে। এ ক্ষেত্রে বাঙলাদেশে ভারতীয় এজেন্টদের সঙ্গে এইসব হিন্দু ভারতীয়ের সম্পর্ক এবং যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, বাঙলাদেশের বামপন্থীরা এ দেশকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার জন্য যে তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে সেই তৎপরতার একটি অংশই হলো গণআদালতে গোলাম আজমের বিচার!

বামপন্থীদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে জামাতে ইসলামী নেতার এই বক্তব্য, বিশেষতঃ ভারতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁর জঘন্য সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে জামাতের শক্তির কোন পরিচায়ক নয়। উপরন্তু মৌলবাদ পরিত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝোঁকার এই প্রচেষ্টা ইসলামী মৌলবাদী হিসেবে তাদের অকার্যকারিতা এবং দেউলিয়াপনারই পরিচায়ক।

ইসলামের কথা বলে কাজ হাসিল করা সম্ভব নয় বলেই যে তারা এখন সাম্প্রদায়িক বক্তব্য হাজির করে, ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে, হিন্দু সম্প্রদায় ও

ভারতের বিরুদ্ধে মুসলমান জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের দুর্ভাগ্য যে, এই কৌশল এ দেশে আর কার্যকর হওয়ার নয়।

ভারত একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী বড়ো ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে তারা বাঙলাদেশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে যে নিযুক্ত থাকবে এ কথা বলা বাহুল্য। এ কাজ যে তারা হিন্দু হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে করছে তা নয়। এই পুঁজিবাদী শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই। এ কারণে বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপালের উপর ভারত চড়াও হয়ে আছে এবং নেপালী জনগণের সঙ্গে ভারতীয় সরকারের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী খারাপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঙলাদেশের উপর ভারতের প্রভাব অথবা এ দেশে ভারতীয়দের তৎপরতা সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সব সময়েই ধর্মের প্রসঙ্গটি সামনে নিয়ে আসে। এভাবে ধর্মের প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসার কিছু অতিরিক্ত "ইহলৌকিক" ফায়দা আছে। এই ফায়দার কারণেই তারা জেনে-শুনে এ ব্যাপারে মিথ্যা প্রচার করে থাকে। জামাত নেতা আব্বাস আলী খানও এদিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রম নন। মিথ্যার আশ্রয় নিতে এঁদের কোন অসুবিধা নেই।

এখানে যে আসল বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার তা হলো মৌলবাদী অবস্থান থেকে সাম্প্রদায়িক অবস্থানে সরে আসা জামাতে ইসলামীর জন্য দরকার হলো কেন? এই দরকার হলো প্রথমতঃ এ কারণে যে, ইসলামী মৌলবাদ প্রচার করে জনগণের মধ্যে চিন্তা ক্ষেত্রে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও তার দ্বারা বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। তার জন্য দরকার হচ্ছে অন্য কিছু। এই "অন্য কিছু" হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা।

জামাতে ইসলামী চরিত্রগতভাবে মূলতঃ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারী হওয়ার কারণে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা তার নেই এবং মৌলবাদ অকেজো হয়ে গেলে এ দেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

কিন্তু ব্যাপারটি স্বাভাবিক হলেও মৌলবাদী দল জামাতে ইসলামীর জন্য এটি এক ধরনের রাজনৈতিক পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চাদপসরণের বিষয়টি এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আব্বাস আলী খানের ১২ই এপ্রিলের বক্তৃতাই শুধু নয়, সমগ্র জামাতে ইসলামী দলের অবস্থানই এখন এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের জিগীর তোলার পরিবর্তে তাদের পক্ষে ভারতের জিগীর তোলাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে কৌশলগত কারণে বেশী জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু তাদের জন্য এটা যতই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী হোক, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোন সম্ভাবনা এ দেশে আর নেই। সে সম্ভাবনা যদি থাকতো তাহলে এ দেশের রাজনীতিতে মুসলিম লীগের মৃত্যু ঘটতো না। ধর্মীয় সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের

অর্থাৎ ধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত মুসলমানদের একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর এ দেশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ভূমিতে সাম্প্রদায়িকতার কোন শক্তি আর নেই। যা অবশিষ্ট আছে কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে সেটা হলো, হিন্দু ধর্মীয় লোকদের প্রতি কিছু বিদ্বেষ, বিরূপতা ইত্যাদি। এই বিদ্বেষ ও বিরূপতা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলতঃ এক ব্যক্তিগত ব্যাপারে। এর কোন রাজনৈতিক সম্ভাবনা আর নেই। ভারত বিরোধিতা সম্পর্কে সেই একই কথা। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ভারত বিরোধিতার কারণ ভারতীয় সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নয়। সে বিরোধিতা মূলতঃ হিন্দু বিরোধিতারই একটি বিশেষ রূপ মাত্র এবং সে কারণেই তার থেকে অবিচ্ছিন্ন।

জামাতে ইসলামী গোলাম আজম সৃষ্ট বিপদের মধ্যে পতিত হয়ে সেখান থেকে উদ্ধার লাভের আশায় এখন সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ গোলাম আজম কর্তৃক ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধের এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর খুন-খারাবী, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও সব ধরনের মানব নির্যাতনের সক্রিয় সহযোগিতার হিসেব ইসলামী মৌলবাদী যুক্তি ও কথাবার্তার দ্বারা দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই সেদিন থেকে জনগণের দৃষ্টি একেবারে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা হিসেবেই তারা এখন ভারতের প্রশ্ন, হিন্দুদের প্রশ্ন এবং ভারতের দালালদের প্রশ্ন ইত্যাদি বানোয়াট সব প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলি জনগণের সামনে নিক্ষেপ করছে। তারা আশা করছে, তাদের এই নিক্ষিপ্ত আবর্জনা জনগণ খুব আদরের সঙ্গে গ্রহণ করে তাদেরকে মাথায় তুলে নাচানাচি করবেন এবং গণআদালত অনুষ্ঠানকারী ও বামপন্থীদেরকে জোরসে ধাওয়া করবেন।

তাদের এই প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এ দেশে বাইশ বৎসর মুসলমান শোষক-শাসকদের অধীনে শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার পর এবং বর্তমান পর্যায়ে দেওয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে যাবার মতো অবস্থায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ করে যে কোন ফায়দাই নেই এবং ফায়দার কোন প্রশ্নই ওঠে না এ কথা জনগণের ব্যাপকতম অংশ নিজেদের অনেক পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও, বেশ ভালোভাবেই জানেন। কাজেই রাজনৈতিক আন্দোলনের টার্গেট বা লক্ষ্যবস্তু হিসেবে তাঁরা "হিন্দু" "ভারতীয় দালাল" ইত্যাদি অলীক ব্যাপারের থেকে এ দেশের মুসলমান নামধারী শোষক-শাসকদেরকেই পাকড়াও করতে এবং তাদের থেকে দাবী-দাওয়া আদায় করতে ও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে উৎখাত করে জনগণের শাসন বা জনগণের গণতন্ত্র কায়েম করতে অনেক বেশী আগ্রহী।

কাজেই জনগণের মধ্যে বিরাজমান হতাশাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী মৌলবাদ এতদিন কিছুটা সুবিধা করে এলেও এখন তাদের সে দিন শেষ হয়েছে। তারা এ দেশে তাদের রাজনৈতিক "বিকাশের" সর্বোচ্চ স্তর এখন পার হয়েছে। সউদী আরব, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশাল আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা প্রাপ্ত সত্ত্বেও তাদের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে বাস্তব ব্যাপার।

এই বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই মৌলবাদ প্রায় শিকেয় তুলে রেখে সাম্প্রদায়িকতাকে কৌশল হিসেবে আশ্রয় ও অবলম্বন করেও বাঙলাদেশের জামাতে ইসলামীর উদ্ধার নেই। এটা হলো তাদের পশ্চাদপসরণেরই একটি ধাপ। কিন্তু শেষ ধাপ নয়। জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধাক্কায় ক্রমাগত পশ্চাদপসরণই এখন বাঙলাদেশের জামাতে ইসলামীর অপ্রতিরোধ্য নিয়তি।

১৫.৪.১৯৯২

দৈনিক আজকের কাগজ
২৬.৪.১৯৯২

স্বৈরতন্ত্র ও 'গণতন্ত্রে'র একই কথা

এ বিষয়টি এখন যথেষ্ট স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিলো এই অর্থে যে, সে নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ ছিলো "ভ্রাতৃপ্রতিম শত্রুদের" মধ্যে। অর্থাৎ যারা সে নির্বাচনে দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের মধ্যে দলগত রাজনৈতিক বিরুদ্ধতা ও শত্রুতা থাকলেও তারা সকলেই ছিলো এক ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রেণী বন্ধনে আবদ্ধ একই শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলো এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এই ভ্রাতৃপ্রতিম শত্রুদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়েছিলো।

তাই এই নিরপেক্ষতা রক্ষিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, শ্রেণী প্রতিনিধিত্বের ও শ্রেণীস্বার্থের ক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোন নিরপেক্ষতা ছিলো। উপরন্তু সে নির্বাচন ছিলো পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট এবং তার উদ্দেশ্য ছিলো কোন না কোনভাবে জনগণের শত্রু অথবা স্বার্থবিরোধী শক্তির শোষণ, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে ক্ষমতার রদবদল ঘটানো। জনস্বার্থের সঙ্গে, এ দেশের মেহনতি জনগণের স্বার্থের সঙ্গে, সেই নির্বাচনের এমন কোন সম্পর্ক ছিলো না যাতে জনগণ ও তাদের শোষক শাসকদের মধ্যে এক্ষেত্রে কোন নিরপেক্ষতার কথা বলা যেতে পারে। আসলে এ সব নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার অর্থ একই শ্রেণী কাঠামোর অন্তর্গত দল ও ব্যক্তির মধ্যে নিরপেক্ষতা। "ভ্রাতৃপ্রতিম শত্রুদের" মধ্যকার নিরপেক্ষতা।

এই ভ্রাতৃপ্রতিম শত্রুতার কারণেই এরশাদের স্বৈরতন্ত্রী সামরিক সরকার জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমে উৎখাতের পর "অবাধ ও নিরপেক্ষ" নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেটাও পূর্ববর্তী সরকারের সঙ্গে দলগত শত্রুতা সত্ত্বেও ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের কারণেই বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার তার সব রকম গণতান্ত্রিক আস্ফালন সত্ত্বেও স্বৈরতান্ত্রিক। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে এই সরকার এমন কোন চরিত্রের দ্বারা গুণান্বিত হয়নি যা মূলগতভাবে, এমনকি উল্লেখযোগ্যভাবে, এরশাদ অথবা তার আগের জিয়াউর রহমান সরকার থেকে চরিত্রগতভাবে ভিন্ন।

এই অভিন্ন চরিত্র (যা তাদের শ্রেণী চরিত্রের থেকেই উদ্ভূত) দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারণেই বিএনপি সরকার, এই সরকার প্রধান এবং সরকারের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, নেতা উপনেতা সকলের কথাবার্তাই এরশাদ ও তার সরকারের লোকজনের কথাবার্তার

অনুরূপ। সামরিক সরকারের লোকদের মুখে যে সব কথা শোনা যেতো, শ্রমজীবী জনগণ, বিরোধী দল, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, সাম্রাজ্যবাদের "মহান" ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে যা শোনা যেতো, সেই একই কথা এখন হুবহু শোনা যাচ্ছে "অবাধ ও নিরপেক্ষ" নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের লোকদের মুখে। এদিকে দিয়ে সামরিক স্বৈরতন্ত্র এবং "নির্বাচিত গণতন্ত্রের" মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এ সব কথাবার্তাই এক এবং অভিন্ন শ্রেণীসূত্রে আবদ্ধ। এই শ্রেণী সূত্রেই বিএনপির সভানেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া স্বৈরতন্ত্রী এরশাদেরই সুযোগ্য রাজনৈতিক উত্তরাসুরি।

এতক্ষণ এই ভূমিকার দরকার হলো ২০শে এপ্রিল গুলিস্তান স্কোয়ারে বিএনপির ঢাকা নগর শাখা আয়োজিত একটি জনসভায় খালেদা জিয়ার আক্রমণাত্মক বক্তৃতার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে। জনসভার এই বক্তৃতায় "গণতান্ত্রিক" সরকারের প্রধানমন্ত্রী শোষিত শ্রেণীসমূহের স্বার্থবিরোধী যে কোন রাজনৈতিক দল ও সরকারের প্রধান হিসেবে যে বক্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রদান করা স্বাভাবিক সেটাই প্রদান করেছেন।

এই বক্তব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জনগণ বর্তমান সরকারকে পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত করেছেন, এই সরকার একের পর এক "গণতান্ত্রিক বিজয়" অর্জন করে চলেছে, এ বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে, বর্তমানে যে সব আন্দোলন হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারকে উৎখাত এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করা, দেশকে বিদেশের (ভারতের?) কাছে বিক্রি করা, ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত গোলাম আজমের শাস্তির যে দাবী গণআদালতে করা হয়েছে সে দাবীর উদ্দেশ্য বিএনপি সরকারকে উৎখাত করা ইত্যাদি।

এই বক্তব্যগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সরকারের প্রলাপোক্তি এবং আবোলতাবোল মনে হলেও আসলে এটা প্রলাপ অথবা আবোলতাবোল নয়। এ সব বক্তব্য শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারকারী এবং সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ভৃত্যদেরই স্বাভাবিক বক্তব্য। এদের বক্তব্যের মধ্যে ভৃত্যসুলভ মনোভাবের প্রাধান্যের কারণ পূর্ববর্তী দুই সামরিক সরকারের মতো এই সরকারের নেতৃত্বেও যারা রয়েছে তাঁদের নয়-দশমাংশই রাজনীতি ক্ষেত্রে ভূঁইফোড়। এঁরা অনেকে বয়স্ক হলেও সারা জীবনে রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক এঁদের ছিলো না। পশ্চাৎপদ দেশের নানা ঘটনাচক্রে এঁরা ক্ষমতাসীন হয়ে দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রী ইত্যাদির ভূমিকার রাজনৈতিক মঞ্চে এক ধরনের অভিনয় করে জনগণকে প্রতারিত এবং সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় জনশত্রুদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় অক্লান্তভাবে নিযুক্ত রয়েছেন।

জনগণের ভোটে ক্ষমতাসীন হলেও জনগণ এই ভোটের মাধ্যমে বিএনপি সরকারের কাছে এমন কোন দস্তখত লিখে দেননি যে কারণে সরকার জনস্বার্থের

বিরুদ্ধে যথেচ্ছ কাজ করে গেলেও জনগণ পাঁচ বছর তাঁদেরকে ক্ষমতায় রাখবেন। জাতীয় অথবা নির্বাচিত সরকার কোন জমিদারী অথবা ইজারা ব্যবস্থা নয়।

কিন্তু জমিদারী অথবা ইজারা ব্যবস্থা না হলেও ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এরা নিজেদেরকে জমিদার অথবা ইজারাদারই মনে করে। খালেদা জিয়ার সরকারও এখন গদিতে বসে জমিদারী চালে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের কথার্বাতা শুনে মনে হয় শুধু পাঁচ বৎসরী বন্দোবস্ত নয়, তাঁরা যেন এদেশে ক্ষমতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করেছেন।

খালেদা জিয়া বলেছেন, এদেশে যখন উন্নতির গতি দ্রুত হতে শুরু করেছে ঠিক তখনই দেশকে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল করার জন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে। ওফ! উন্নতি দেশের কতো হচ্ছে তার হিসেব দেশ বিদেশের অনেক খাতায় পাওয়া যাবে। কিন্তু পূর্ববর্তী আমলের মতো খালেদা জিয়ার সরকার ও দলের লোকদের "উন্নতি" যে খুব দ্রুত তালে হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই, যদিও সে উন্নতির পরিচ্ছন্ন হিসেব .কোন খাতায় পাওয়া সম্ভব নয়।

আসলে যারাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, জনগণের স্বার্থে সংগ্রাম সংগঠিত করতে নিযুক্ত হয় তাদেরকেই জনশত্রুরা কতকগুলি বাঁধাধরা আখ্যায় ভূষিত করতে থাকে। এই সব আখ্যা যেহেতু শ্রেণীগতভাবেই ঠিক করা থাকে সে কারণে নোতুন করে সেগুলি তৈরী করতে হয় না। সামরিক স্বৈরতন্ত্রী সরকার, নির্বাচিত সরকার সবার মুখেই এই ব্যাখ্যা, এক যুক্তি এবং এক কথা। এদিক দিয়ে শ্রেণীগতভাবে তাদের নড়চড় নেই। খালেদা জিয়া ভাগ্যচক্রে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও কোন নড়চড় করছেন না। সে কাজ করার কোন ক্ষমতা এদের কারো নেই।

জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের সময় "উৎপাদনের রাজনীতির" যে ধুয়ো তোলা হয়েছিলো সেই ধুয়ো তুলেই খালেদা জিয়া রাজনৈতিক বাজিমাৎ করার চেষ্টা করছেন। জিয়াউর রহমান খাল কাটার কর্মসূচী গ্রহণ করে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে গ্রামের গরিবদের জমিজমার উপর খাল কেটে তাদের জমি পানিতে ফেলে সর্বনাশ করেছিলেন সেই একইভাবে এখন খালকাটা চলছে। এই সব হাস্যকর অনুকরণ বিএনপি দল ও তার সরকারের কোন কাজে আসবে না, এর দ্বারা তাদের রক্ষা হবে না। নিজেদের পাঁচ বৎসর ক্ষমতাসীন থাকার সঙ্গে 'দেশপ্রেম' 'গণতন্ত্র' 'দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি' ইত্যাদিকে জড়িত করে বিএনপি এবং তাদের সরকার যে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির ধাক্কায় সে সব প্রচার প্রচারণা অকেজো হবে।

২০শে এপ্রিল গুলিস্তান স্কোয়ারে জনসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পরিষদে বিএনপির ন্যক্কারজনক ভূমিকার সাফাই গাওয়া এবং যাঁরা গোলাম আজমের শাস্তি, জামাত কর্তৃক ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি এবং বিএনপি, জামাতে ইসলামীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরোধিতা নানাভাবে করছে তাদেরকে ভারতের দালাল, দেশের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু ইত্যাদি হিসেবে আখ্যায়িত করে জনগণের সামনে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা।

কিন্তু বিএনপি "পাঁচ বৎসরের" জন্য "জনগণের ইচ্ছা" অনুযায়ী ক্ষমতাসীন হয়েছে এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে ক্ষমতাসীন সরকার শ্রমিক বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী সাধারণভাবে জনস্বার্থ বিরোধী যে সব কাজ করে চলেছে, সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশকে খোলাখুলি বিক্রি করে দেশীয় স্বার্থ বিরোধিতার যে সব নজির স্থাপন করেছে এবং জামাতে ইসলামীকে সঙ্কট থেকে মুক্ত করার জন্য যে সব হীন এবং ন্যক্কারজনক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তার প্রতিফল তাদেরকে জনগণের কাছেই পেতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ বিএনপি অথবা অন্য কারো কাছে এ দেশ ইজারা দেননি।

সামরিক স্বৈরতন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিএনপির বেসামরিক ও নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র যা করেছে অনির্দিষ্টকাল সেটা চলতে পারে না। এ দেশের জনগণের হাতেই সব ধরনের স্বৈরতন্ত্রীকে প্রতিফল ভোগ করতে হবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে সে প্রতিফল আরো কঠিন কঠোর হতে বাধ্য, কারণ জনগণের চেতনার স্তর ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। এই উর্ধ্বমুখী চেতনা শুধু ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, জামাতে ইসলামী ইত্যাদির বিরুদ্ধেই নয়, লুটপাটের অর্থনীতি ও রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং ছাঁটাই বন্ধ, মজুরী বৃদ্ধি ও প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকারের দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন ও সংগ্রামের দিকে শ্রমজীবী জনগণকে দ্রুত এগিয়ে নেবে।

২১.৪.১৯৯২

দৈনিক ভোরের কাগজ
২৫.৪.১৯৯২

বাঙলাদেশে জামাতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

বাঙলাদেশে প্রগতিশীল রাজনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে জামাতে ইসলামী একটি বিরুদ্ধ শক্তি। শুধু তাই নয়, এই দলটি ও দেশের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সব থেকে বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। এ দেশে যে সব রাজনৈতিক দল ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করে থাকে তার মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো জামাতে ইসলামী।

একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে জামাতে ইসলামী বাঙলাদেশে সামন্তবাদের অবশেষ, লুণ্ঠনকারী ধনিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের খেদমতগার হিসেবে সক্রিয় থাকলেও এ ধরনের অপরাপর দলের সঙ্গে এদের পার্থক্য এই যে, এরা আমাদের দেশের জনগণের পশ্চাৎপদ চিন্তা ভাবনার উপর ভিত্তি করেই সর্বতোভাবে নিজেদের কর্মসূচী নির্ধারণ ও কার্যকর করে। এ কাজ করতে গিয়ে তারা শ্রমিক কৃষকসহ সকল শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের বিরোধিতা করে, নারীর অধিকার অর্জনের যে কোন প্রচেষ্টা ও কর্মসূচীর এরা সম্পূর্ণ বিরোধী এবং চিন্তাগতভাবে এরা পশ্চাৎপদ মানুষের চিন্তা চেতনায় আলোক সঞ্চারের পরিবর্তে বিদ্যমান অন্ধকার গভীরতর করতে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই ধরনের একটি রাজনৈতিক দল যে ফ্যাসিস্ট চরিত্রসম্পন্ন হবে তাতে সন্দেহ নেই।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মানবতার বিরুদ্ধে অনেক হীন অপরাধের সক্রিয় সহযোগী এবং যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বাঙলাদেশী নাগরিকত্ব ১৯৭২ সালে বাতিল করা হয়েছিলো। এখনো পর্যন্ত গোলাম আজম এ দেশের নাগরিক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগত ডিসেম্বর মাসে বাঙলাদেশের জামাতে ইসলামী তাকে নিজেদের দলের সর্বোচ্চ নেতা বা আমীর নির্বাচিত করেছে। এই কাজটি সাংবিধানিক আইনের সীমা সাংগঠনিকভাবে লঙ্ঘন করার ফলে গোলাম আজম প্রশ্নটি সামনে এসেছে এবং তার বিরুদ্ধে ও সেই সঙ্গে জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

দেশীয় শোষক শ্রেণীসমূহের বিভিন্ন অংশ একের পর এক সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রী সরকার, মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন দেশ, বিশেষতঃ সউদী আরব এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট হয়ে এই চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলটি যেভাবে নিজের সাংগঠনিক বিস্তার ঘটিয়ে চলেছিলো সে ধারাটি উচ্চতম পর্যায় বা একটা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে এখন নিম্নগামী হয়েছে। গোলাম আজমের

বিচারের দাবীতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং তার বিচার করে গণআদালতে যে রায় প্রদান করা হয়েছে সে আন্দোলন ও রায় শুধু গোলাম আজমের বিরুদ্ধেই নয়। এই প্রতিরোধ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধেও পরিচালিত। এ কারণে এ আন্দোলনের সূত্রপাত বুর্জোয়াদের দ্বারা ঘটলেও এর বিকাশ ঘটানো বিপ্লবীদের ও সমাজতন্ত্রীদেরও কর্তব্য।

ইরান, মিশর, আলজিরিয়া ইত্যাদি দেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটি বাঙলাদেশের বিশেষ বাস্তব এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারাই সৃষ্ট ও নির্ধারিত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, এরা এদেশের সকল ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাৎমুখী ও নির্যাতনকারী শক্তিসমূহের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। ১৯৭২ সাল থেকে বাঙলাদেশে যে লুণ্ঠনকারী নব্য ধনিক শ্রেণীটি গঠিত হতে শুরু করে সে শ্রেণীটিরও রাজনৈতিক প্রতিনিধি জামাতে ইসলামী। সে কারণে এদের সঙ্গে লুটপাট ও ধন সম্পদ অর্জন প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপরোক্ত কয়েকটি দেশের মৌলবাদীরা ক্ষমতায় যাওয়ার প্রচেষ্টায় আন্দোলনে নিযুক্ত থাকার সময় লুটপাট ও ধনসম্পদ অর্জনের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ দেখা যায় না। ইরানে এখন যাই হোক, সংগ্রামে নিযুক্ত থাকার সময় তাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য ছিলো।

বাঙলাদেশের জামাতে ইসলামী নেতারা অবশ্য অন্য ধাতুতে গড়া। এদের মধ্যে যাদের শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ নেই, এমনকি ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেও যাদের শিক্ষা বিশেষ নেই, তারা টাকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ মহফিলে বক্তৃতা করে টাকা পয়সা রোজগার করে। অন্যেরা কেউ ব্যাংকের ডিরেক্টর, ব্যবসায়ী, শিল্পমালিক, বড়ো জমির মালিক, সংবাদপত্র মালিক, হাসপাতালের ডিরেক্টর ইত্যাদি হিসেবে ধনসম্পদ অর্জনে বিশেষ তৎপর। এদিক দিয়ে এরা এদেশের লুটপাটকারী নব্য ধনিক শ্রেণীর একটি অংশ মাত্র।

সম্পত্তি মালিকানার সঙ্গে জামাতে ইসলামীর এই সম্পর্কের কারণে বাঙলাদেশের কোন ধরনের প্রগতিশীলতা ও বিকাশমানতার সঙ্গে এই দলটির সম্পর্ক নেই। অথচ বাঙলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যাতে শুধু ছোটখাট সংস্কার নয়, ব্যাপক ও মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন অপরিহার্য হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের এই তাগিদ এবং জামাতে ইসলামীর শ্রেণী চরিত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের দাসসুলভ সম্পর্কের কারণে বাঙলাদেশে তাদের রাজনৈতিক বিকাশের কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের বিগত কিছুদিনের 'অপ্রতিহত' রাজনৈতিক 'অগ্রগতি' সত্ত্বেও একথা সত্য। এবং ঠিক এ কারণেই জামাতে ইসলামীর নেতা গোলাম আজমের বিচার দাবীকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সে আন্দোলন যদি বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা কোন পর্যায়ে পরিত্যক্ত হয় এবং সরকার যদি অব্যাহতভাবে জামাতে ইসলামীকে সাহায্য সহযোগিতা করে চলে তা হলেও রাজনৈতিকভাবে জামাতে ইসলামীর ক্রমবর্ধমান

বিকাশ ও ক্ষমতা দখলের কোনই সম্ভাবনা নেই। তারা খুব জোর যা করতে পারে সেটা হলো নিজেদের খোঁয়াড় থেকে লোকজন বের করে এনে টাকার জোরে বড়ো বড়ো কিছু সমাবেশ কিছু দিন ধরে চালিয়ে যাওয়া ও সেই সঙ্গে সুযোগ সুবিধা মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।

একটি ধর্মীয় মৌলবাদী দল হিসেবে মৌলবাদ একরকম পরিত্যাগ করে জামাতে ইসলামী এখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় দালাল ও সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলেছে। এ জিগীর তাদের রাজনৈতিক পশ্চাদপসরণেরই অভ্রান্ত প্রমাণ। জামাতে ইসলামীর রাজনৈতিক সম্ভাবনাহীনতা তাদের এই পশ্চাদপসরণের থেকে আজ নোতুনভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ এদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

২৪.৪.১৯৯২

আরণ্যক
মে সংকলন ১৯৯২

কৃষক শ্রমিকরা কেন জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন

কৃষি শ্রমিকরা জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কেন সংগ্রাম করবেন সেটা বোঝার জন্য দেখা দরকার এরা কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি। ইসলামী আইন কানুন এবং হুকুমাত বা সরকার কায়েম করার আওয়াজ তুলে পথে নামলেও এরা আসলে সেই সব শ্রেণীর ও শক্তিরই খেদমত করে যারা কৃষক শ্রমিকের শত্রু দেশীয় শত্রু এবং বৈদেশিক শত্রু।

জামাতীদের কথা হলো, বর্তমান ব্যবস্থায় দুর্নীতি, শোষণ নির্যাতন রয়েছে তার কারণ এখানে আল্লাহর আইনের বদলে মানুষের আইন চালু আছে। কাজেই মানুষের আইনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন চালু করাই হচ্ছে সকল মুমীন মুসলমানের একমাত্র জরুরী রাজনৈতিক কর্তব্য।

আল্লাহর আইন বা ইসলামী হুকুমাত বলতে ঠিক কি বোঝায় তার কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এদের বক্তব্য এবং প্রচার প্রচারণার মধ্যে নেই। যেটুকু আছে তার থেকে একেবারেই বোঝার উপায় নেই যে, ইসলামী আইন ও হুকুমাত চালু হলে কৃষক শ্রমিকের অবস্থা কি হবে, উৎপাদন সম্পর্কের কি হবে, জমি কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদির মালিকানা কার হাতে থাকবে? তাদের কথা থেকে বোঝার উপায় নেই যে, বর্তমান ধনসম্পত্তি যে মালিক শ্রেণীর তাদের ধনসম্পত্তির কি অবস্থা হবে ইসলামী আইন ও হুকুমাত চালু হলে।

জামাতে ইসলামীর বক্তব্য অনুযায়ী সব কিছুর মালিক আল্লাহ। কিন্তু এই মালিকানা আল্লাহর হলেও মানুষই এগুলির ব্যবহারকারী এবং এই "ব্যবহারকারীই" হলো ধনিকশ্রেণী, যাদের হাতে ধনসম্পদ ও পুঁজি কেন্দ্রীভূত রয়েছে। জামাতের নেতা এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীরাও অনেকে বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক। আল্লাহর পক্ষ থেকেই তারা এই ধনসম্পদ ও পুঁজির "হেফাজত করছে"।

এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহর মালিকানা এবং ধনসম্পদের ও পুঁজির ব্যক্তি মালিকানার মধ্যে বাস্তবতঃ কোন পার্থক্য নেই। কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকরাই সব কিছু উৎপাদিত ধনসম্পদ ভোগ দখলের পুরো মালিক। আল্লাহর এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নামে শোষক শাসকরাই নিজেদের শোষণ শাসন এই নীতি অনুযায়ী চালিয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে এখন চালিয়ে যাচ্ছে।

কাজেই এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, জামাতে ইসলামী শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলির একটি হলেও তাদের মধ্যে সব থেকে চতুর এবং বিপজ্জনক। সমাজে যে শোষণ নির্যাতন ও বঞ্চনা রয়েছে সেগুলিকে আল্লাহর আইন ও হুকুমাত ইত্যাদি কথার দ্বারা আড়াল করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

এখানেই শেষ নয়। ইসলামী আইন চালু করার নামে জামাতে ইসলামী জনগণের মধ্যে বাস্তবতঃ যে পশ্চাৎপদ চিন্তাভাবনা রয়েছে সেগুলিকে দূর না করে সেগুলি অবলম্বন করেই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ও শক্তি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে। শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম অংশ আল্লাহ্য় বিশ্বাসী। জামাতীরা তাঁদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে কৃষক-শ্রমিকের দাবী-দাওয়া নিয়ে যারা লড়াই করে, যারা কমিউনিস্ট, বামপন্থী, এমনকি গণতন্ত্রী নামে পরিচিত তারা আল্লাহ বিরোধী। কাজেই, তাদের দ্বারা কৃষক-শ্রমিকের কোন প্রকৃত উপকার হতে পারে না। উপরন্তু এর দ্বারা তাদের ঈমান নষ্ট হবে এবং ইহলোকে তাদের কোন উন্নতি তো হবেই না, উপরন্তু পরলোকে তারা দোজখে যাবে।

শুধু সাদামাটা যুক্তির দ্বারাই নয়, অন্য অনেকভাবে তারা কৃষক শ্রমিকের পশ্চাৎপদ চেতনাকে নাড়া দেয়, তাঁদের চিন্তা শক্তিকে পঙ্গু ও খর্ব করে এবং নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে সংগ্রামের পথ থেকে তাঁদেরকে সরিয়ে রাখে। এটাই হলো জামাতে ইসলামী কর্তৃক ধর্মের, এক্ষেত্রে ইসলামের, রাজনৈতিক ব্যবহারের আসল লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং চরিত্র। জামাতে ইসলামী ছাড়াও শোষক শ্রেণীসমূহের অনেক দল নানাভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু জামাতীরাই এদিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং এ দেশের সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ও শ্রমিক কৃষক বিরোধী রাজনৈতিক দল। সেই হিসেবে মুখে এরা যাই বলুক এবং যাই প্রচার করুক কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থে এরা কখনো কিছু করে না এবং করতে পারে না। তারা মুখে অনেক সমবেদনা জানালেও কার্যক্ষেত্রে তারা সব সময়েই শোষক শ্রেণীর পক্ষে থাকে, তাদেরকেই সক্রিয়ভাবে এবং প্রায় সরাসরি সমর্থন দেয়। শ্রমজীবী জনগণের সকল প্রকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের এরা বিরোধী। ঠিক এ কারণেই বর্তমান বিএনপি সরকারও তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করছে।

এ বিষয়টিই আমাদের দেশের শ্রমিক কৃষকদের ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই জামাতে ইসলামীর মতো রাজনৈতিক দলকে উৎখাত করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

৩.৫.১৯৯২

পাক্ষিক জনযুগ
২৫.৫.১৯৯২

শ্রমিক, কৃষক ও নারী সমাজকে কেন জামাতে ইসলামীর বিরোধিতা করতে হবে?

গতকাল ১৭ই মে 'পাটকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ' এবং 'রাষ্ট্রায়ত্ত সুতা-বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন' যৌথভাবে এক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে সরকারের শ্রমিক ছাঁটাই-এর সিদ্ধান্ত বাতিল এবং শ্রমিকদের মজুরী নোতুনভাবে নির্ধারণের জন্য সরকার-প্রতিশ্রুত মজুরী কমিশন গঠনের দাবী জানিয়েছেন। মালিক শ্রেণী, তাদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সরকার এবং তাদের আন্তর্জাতিক রক্ষাকর্তা মার্কিন ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল বাঙলাদেশের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ছাঁটাই এবং মজুরী কমানোর যে সর্বশেষ চক্রান্ত করছে তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ এবং দাবী খুবই স্বাভাবিক।

এই স্বাভাবিক ব্যাপারটিই এখন ঘটছে। বাঙলাদেশের অর্থমন্ত্রী প্যারিস কনসোর্টিয়ামের বৈঠক থেকে ফিরে এসে একলক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই-এর এক "গণতান্ত্রিক কর্মসূচী" ঘোষণার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে শুধু শ্রমিক সংগঠনগুলিই নয়, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলিও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শ্রমিকরা সরকারের এই ছাঁটাই কর্মসূচী প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করতে এগিয়ে আসছেন। শুধু তাই নয়, বাঙলাদেশে এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের মধ্যে বিরাজমান এক গভীর অস্থিরতা এক ব্যাপক ও বিরাট আন্দোলনের দিকেই শ্রমিকদেরকে চালনা করছে।

মালিক শ্রেণী ও তাদের সরকার যে এই আন্দোলন প্রতিরোধ করবে তাতে সন্দেহ নেই। তারা সেটা করছে। সেখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যারা শ্রমিকদেরকে ছাঁটাই করার "কর্মসূচী" ঘোষণা করেছে এবং জনগণের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে তারা যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিযুক্ত ব্যক্তি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলকে বিদেশী দালাল, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে দিবারাত্রি চিৎকার করছে। তাদের এই চিৎকার পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ঠিক এই মুহূর্তে এ দেশের চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল, ধর্মব্যবসায়ী জামাতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন হচ্ছে। এই আন্দোলন জামাতের আমীর একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধী এবং বর্তমানের গণশত্রু গোলাম আজমের ফাঁসির দাবীকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হলেও এর লক্ষ্য ব্যক্তি গোলাম আজমের বিরুদ্ধে

কোন প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ নয়। এর লক্ষ্য হলো এক চরম মানবতাবিরোধী অপরাধী, বিদেশী দালাল এবং ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম এমন ধরনের যা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে কিছুদিনের মধ্যেই একটি প্রকৃত এবং যথার্থ মুক্তি সংগ্রামে পরিণত হওয়ার মতো সম্ভাবনাময়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল বাঙলাদেশের স্বাধীনতা, এ দেশে একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্য ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয়েছে। কিন্তু বাঙলাদেশে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনই সেই মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো না। ব্যাপক কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত জনগণ সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অপার দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছিলেন এ দেশে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। এক হিসেবে এই লক্ষ্যই ছিলো ব্যাপকতম জনগণের মূল লক্ষ্য।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাঙলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি। উপরন্তু সেদিক দিয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। এ দেশে পাকিস্তানী অবাঙালীদের পরিবর্তে আমাদের দেশীয় লোকেরাই ধনসম্পত্তির মালিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জনগণের অবস্থার উন্নতি না ঘটিয়ে ক্রমাগত অবনতি ঘটিয়ে চলেছে।

এই অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবরকম প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করছে। এক সময়কার পরাজিত শত্রুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে গণশত্রু হিসেবে জনগণের ওপর তাদের চক্রান্তমূলক কর্মসূচী কার্যকর করতে নিযুক্ত হয়েছে। কাজেই এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, জামাতে ইসলামীর মতো একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ এবং মধ্যপ্রাচ্যের নিকৃষ্ট শাসকচক্রের অর্থে প্রতিপালিত একটি দল বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের ওপর সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে নিযুক্ত থাকবে।

এদিক দিয়েই জামাতে ইসলামীর সঙ্গে বর্তমানে ক্ষমতাসীন মালিকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ বি.এন.পি. সরকারের ঐক্য। এই ঐক্যের কারণেই নিজেদের গণবিরোধী চক্রান্তের সর্বাপেক্ষা বড়ো সহায়ক দল হিসেবে জামাতের সঙ্গে বি.এন.পি. এখন ঘনিষ্ঠভাবে আঁতাতবদ্ধ হয়েছে। এ কারণেই গণআদালতে গোলাম আজমের ফাঁসির দাবী ক্রমশঃ জামাতের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত জনগণের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবীদাওয়া আদায়ের আন্দোলনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাতে আতঙ্কিত হয়ে তারা দিশেহারা অবস্থায় নানা এলোমেলো বক্তব্য প্রদান করছে। এই বক্তব্য "এলোমেলো" হলেও এসব তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

এই "এলোমেলো" বক্তব্যের মধ্যে সর্বপ্রধান হলো, বর্তমানে যারা আন্দোলন করছে তারা দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী এবং তারা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত

গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই আন্দোলন করছে। কাজেই তারা গণতন্ত্রের ও দেশের শত্রু!!

বি.এন.পি. দলীয় প্রধানমন্ত্রী এখন ধুয়োর মতো এই আওয়াজ তুলে সেমিনার, প্রেস বিবৃতি, জনসভার বক্তৃতা সর্বত্রই নিজেরই বক্তব্য উপস্থিত করছেন। তাঁর এইসব বক্তব্য খুব জোরেশোরে প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আওতাধীন পুলিশ ও প্রশাসনকেও আন্দোলনের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা এই ধরনের সরকারের পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

এটা স্বাভাবিক হলেও বোঝা দরকার সরকারের শ্রমিক বিরোধিতা, নানাভাবে কৃষক স্বার্থবিরোধিতা, নানা পেশাজীবী জনগণের স্বার্থবিরোধিতার সঙ্গে, জামাতের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কটি ঠিক কি ধরনের। কি ধরনের গাঁটছড়ায় বাঁধা থাকার ফলে সরকার শ্রমিক কৃষক বিরোধিতা এবং জামাতে ইসলামের সহযোগিতা একই সঙ্গে করে যাচ্ছে।

এই গাঁটছড়াটি হলো, আমাদের দেশের জনগণের সব ধরনের শত্রুদের মিত্র হিসেবে এদের উভয়ের অবস্থানের অভিন্নতা। দেশীয় ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এদের বন্ধু এবং এদের শত্রুরা অভিন্ন। এই অভিন্ন চরিত্র বি.এন.পি. সরকার নিজেরাই জামাতে ইসলামীর প্রতি সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করছে। এটা একদিক থেকে ভালোই হচ্ছে কারণ এর মাধ্যম জনগণের কাছে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, জামাতে ইসলামী শুধু একাত্তরের ঘাতক দালাল হিসেবেই অপরাধী নয়। তারা একই সঙ্গে অপরাধী আমাদের দেশের রাজনীতিতে তাদের বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী ভূমিকার জন্যও।

ইসলামের নাম ব্যবহার করে, ধর্মকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে জামাতে ইসলামী যে মূল রাজনৈতিক কাজটি করছে সেটা হলো, শ্রমিক কৃষকসহ সব ধরনের মেহনতি জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে জনগণের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্তমূলক কর্মসূচী কার্যকর করে যাওয়া।

নারী সমাজের বিরুদ্ধেও জামাতে ইসলামীর অবস্থান খুব স্পষ্ট ও পরিচিত। যেখানেই এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা ক্ষমতায় যায় সেখানেই মেয়েদেরকে শুধু বোরখা পরিয়েই (আফগানিস্থান এর সর্বশেষ উদাহরণ) এরা ক্ষান্ত হয় না, এরা নারী শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায়। আমাদের দেশেও জামাতে ইসলামী এখনো এই সমাজের বিরুদ্ধে, তাঁদের স্বাধীনতা, তাঁদের কাজের অধিকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে নানা ধরনের ঘৃণ্য বক্তব্য অহরহ বক্তৃতা বিবৃতি এবং ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে প্রদান করছে। কাজেই এ দেশে যারা নারী মুক্তি আন্দোলন করছেন, যে সমস্ত নারী শ্রমিক ও কর্মচারী বিভিন্ন কলকারখানা এবং অফিসে কাজ করছেন তাঁদের নিজেদের অধিকার অর্জনের সংগ্রামের সঙ্গে জামাতে ইসলামীর বিরোধিতা একই সূত্রে গ্রথিত রয়েছে।

জামাতে ইসলামীর আমীর গোলাম আজমের ফাঁসির দাবীকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন এখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে তার আসল তাৎপর্য এখনো সকলের কাছে স্পষ্ট না হলেও আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেটা ক্রমশঃ এবং দ্রুত স্পষ্ট হচ্ছে। এ কারণে এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তারা সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকুক অথবা তার বাইরে থাকুক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তারা সকলেই এই দেশের মাটি থেকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন হবে, হতে বাধ্য।

তবে এই নিশ্চিহ্নকরণের কাজটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে না। এর জন্যে দরকার সচেতন সংগ্রাম, সংগ্রামের আক্রমণের লক্ষ্যসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী জনগণই যেহেতু দেশের প্রতিরোধী মূল অংশ সে কারণে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার কাজ চালাতে হবে, তাঁদেরকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে কেন তারা একদিকে যেমন নিজেদের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীগত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবীদাওয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করবেন তেমনি অন্যদিকে তাঁদেরকে সংগ্রাম করতে হবে সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে। তাঁদেরকে বোঝতে হবে এবং তার জন্য তাঁদেরকে বোঝাতে হবে, কেন শ্রমিক কৃষকসহ সকল শ্রমজীবী জনগণ জামাতে ইসলামীর বিরোধিতা করবেন। তাঁরা এটা ঠিকমতো বোঝাতে সক্ষম হলে একদিকে যেমন জামাতে ইসলামীকে রাজনৈতিকভাবে এদেশ থেকে উৎখাত করা সম্ভব হবে তেমনি সম্ভব হবে শ্রমিক কৃষকের, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মজীবীদের, নারী সমাজের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে নেওয়া, তার সাফল্যকে নিশ্চিত করা।

১৮.৫.১৯৯২

দৈনিক আজকের কাগজ
২১.৫.১৯৯২